অন্ধকারের অহংকার

মুহাম্মদ সেলিম রেজা

অন্ধকারের অহংকার

অন্ধকারের অহংকার

মুহাম্মদ সেলিম রেজা



অভিযান পাবলিশার্স

ANDHAKARER AHANKAR
a Bengali crime thriller
by Muhammad Selim Raja

প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩

অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে মারুফ হোসেন কর্তৃক ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত।
দূরভাষ : +৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
E-mail : abhijankolkata@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস : অক্ষরবৃত্ত
প্রুফ সংশোধন : শ্যাম চৌধুরি
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : আমন প্রেস
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেকট্রনিক্স
বাঁধাই : প্রিয়া বুক বাইন্ডার্স

বিক্রয়কেন্দ্র
অভিযান বুক ক্যাফে, ১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
চণ্ডাল বুকস (শিলিগুড়ি), চয়নিকা (সাঁইথিয়া), মালদা পুনশ্চ (মালদা) মুক্তধারা (দিল্লি)
বাংলাদেশ : বাতিঘর, তক্ষশিলা, কবি প্রকাশনী
Online available on : www.dokandar.in ও abhijanbooks.com

ISBN : 978-93-91869-23-7

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস

₹ ৩০০
$ 15

পুত্র যাকী শাহরিয়ার রেজা
কন্যা নাফিসা রেজা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাতের প্রথম প্রহরে ঝোড়ো বাতাসসহ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও তার রেশ কাটেনি। বাতাসের তীব্রতা ততটা না থাকলেও ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠছে আলোর ফুলকি, কড়কড় শব্দে কেঁপে উঠছে ত্রিভুবন। এরই মাঝে একটি মোটর বাইক হেডলাইটের জোরালো আলোয় অন্ধকার ফালা ফালা করে ছুটে চলেছে উত্তরমুখী, গন্তব্য উধমপুর ইনডাসট্রিয়াল এস্টেট।

বাইক-চালকের বয়স তিরিশের কোঠায়, সহযাত্রী তার থেকে বছর দুয়েকের ছোটোই হবে। উভয়ের আপাদমস্তক কালো রেনকোটে ঢাকা। মাথায় হেলমেট। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ছুটে চলেছে তারা। বারাসাত থেকে উত্তরবঙ্গের ডালখোলা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজপথ দেশের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তার একটি। সারাদিনে কয়েক হাজার যানবাহন দৌড়োদৌড়ি করে। রাতেও তার বিরাম নেই। পণ্যবাহী লরির কনভয় আগে আগে ছুটে চলেছে। চালক নিপুণ হাতে একটার পর একটা লরি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকল।

বহরমপুর শহরের অনতিদূরে উধমপুর। নিউ ইনডাসট্রিয়াল বেল্ট। বছর পাঁচেক আগে এক বাঙালি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাসমারোহে উদ্‌বোধন করেছেন। অল্পদিনের ব্যবধানে কলকারখানা গড়ে ওঠার পাশাপাশি ছিমছাম একটি শহরের পত্তন হয়েছে। অথচ এখানে শহর কেন, ছোটো জনবসতি গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

সুখীর মোড় পিছনে ফেলে এসে তুলনামূলকভাবে ছোটো, ততোধিক সুন্দর একটি রাস্তা সরীসৃপের মতো বুক চিতিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গেছে। ওই পথ ধরে কিলোমিটার তিনেক গিয়ে উধমপুর। শহরের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অভিজাত এলাকা। এখানে বেশ কিছু কারখানা মালিক ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছেন।

এলাকাটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, প্রবেশপথে রয়েছে সিকিউরিটি পোস্ট। তাদের চোখ এড়িয়ে অনাহূত কারও পক্ষে ভিতরে ঢোকা মুশকিল শুধু নয়, একেবারে অসম্ভব। সিকিউরিটি পোস্ট ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে কৈলাস ভিলা। এই ভবনের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত কৈলাসপ্রসাদ রায়, উমধপুর স্পিনিং মিলের মালিক কাম সিইও। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতেই বাইক আরোহীর এখানে আসা।

নির্দিষ্ট বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা তফাতে রাস্তার একধারে বাইক দাঁড় করাল চালক। প্রথমে সহযাত্রী নেমে দাঁড়াল। চালক বাইকের সিটে বসে থেকে চারপাশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিল। তারপর সোজা হয়ে সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি ভেতরে গিয়ে কথা বলে আসছি।

— তোমার একা ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে?

— আশেপাশে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাক। প্রয়োজন হলে ইশারা করব।

— ঠিক আছে গুরু। তুমি কিন্তু একদম মাথা গরম করবে না। মাসিমার কথা তোমার মনে আছে তো?

— মনে না থাকলে এই দুর্যোগের মাঝে ছুটে এলাম কোন স্বার্থে? লিয়াকতকে নির্দেশ দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কৈলাস ভিলা মাটিতে মিশিয়ে দিতে আধঘন্টা সময় নিত না সে।

চালক পকেট থেকে রিভলবার বের করে ভেঙে দেখল, আপন আপন কুঠুরিতে নিরীহ দানাগুলো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। শুধু খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেবার অপেক্ষা। যন্ত্রটা ঠিক করে নিয়ে নলের ডগায় আলতো করে একটি চুমু দিল সে। সহযাত্রী ডানহাতের বুড়ো আঙুল খাড়া করে বলল, বেস্ট অফ লাক।

মাথা নেড়ে সহযোদ্ধার অভিবাদন গ্রহণ করে গুটিগুটি পায়ে পাঁচিলের দিকে এগোতে থাকল চালক। কাছাকাছি পৌঁছে ডানে-বামে ঘাড় ঘুরিয়ে পজিশন দেখে নিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে এল। অতঃপর দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে পাকা জিমন্যাস্টের মতো শূন্যে শরীর ছুঁড়ে দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠে বসল।

ছিমছাম দোতলা বাড়ির সামনে সাজানো বাগান। নানা জাতের পাতাবাহার, দেশি-বিদেশি ফুলগাছের সমাহার সেখানে। বাগান শেষে গাড়ি-বারান্দা। সেখানে একটি স্টিল কালারের স্করপিয়ো গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা স্কুটি। মূল প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি পোস্ট। ডিউটিরত এক জওয়ান টুলে বসে ঝিমোচ্ছে। চালক লাফ দিয়ে পাঁচিল থেকে নীচে নামল। অতঃপর হাওয়ার গতিতে ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত জওয়ানের গর্দানে সজোরে আঘাত করল। ছেলেটা কলাগাছের মতো উলটে পড়ে গেল। তার ইউনিফর্মের পকেট হাতরে একটা গ্যাস লাইটার আর খান চারেক বিড়ি ছাড়া কোনো অস্ত্রটস্ত্র পাওয়া গেল না। একমাত্র লাঠিখানা মেঝেয় গড়গড়ি খাচ্ছে। লাঠিটা তুলে নিয়ে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে। তারপর এগিয়ে গেল কৈলাস ভিলার মূল প্রবেশদ্বারে।

দরজার মাথায় কলিং বেলের বোতাম। বোতামে চাপ না দিয়ে দরজায় মৃদু আঘাত করল। প্রথমবার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বারেও না। তৃতীয়বার আঘাত করতে ঘুমজড়িত কণ্ঠে কেউ সাড়া দিল, কে! হরি?

হরি যে-ই হোক আগন্তুকের তাতে কিছু আসে যায় না। সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। পুনরায় দরজায় টোকা দিল।

— যত জ্বালা হয়েছে আমার। রাতেরবেলা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাব তার জো নেই। এই ব্যাটা হরি কথা বলছিস না কেন? হারামজাদা কী হয়েছে বলবি তো? গজরাতে গজরাতে এসে পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন দরজা খুলে ধরলেন। চকিতে বিশাল ভিতরে ঢুকে তাঁর কপালে রিভলবারের নল চেপে ধরল, একদম চিল্লামিল্লি করবেন না। অন্যথায় সব ক-টা দানা মাথায় গেঁথে দেব।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেও ভীত হলেন না। প্রাথমিক শক সামলে উঠে বললেন, কে তুমি? কী চাও এখানে?

— আমি আপনার একান্ত আপনজন, রক্তের সম্পর্ক আমাদের। আগন্তুক পিছিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি আটকে আবার পূর্বস্থানে ফিরে পুনরায় বলল, মাঝরাতে ডিস্টার্ব করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এছাড়া আমার সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না।

— কেন এসেছ আমার কাছে?

— আপনার টাকাকড়ি ধনদৌলতের প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। জাস্ট কয়েকটি প্রশ্ন করার আছে। আশা করি সঠিক উত্তর দেবেন।

— যদি না দিই?

— কী হবে আমি নিজেও জানি না। লেখাজোখা নেই এই হাতে কতগুলি মানুষ খুন করেছি। সঠিক জানি না আমার নামে কতগুলি কেস চলছে। আপনাকে খুন করলে সংখ্যাটা না হয় একটু বাড়বে।

— ভয় দেখাচ্ছ?

— মনে করুন তাই। মিস্টার কৈলাসপ্রসাদ রায় বিগত ক-মাসে আপনাকে আমি কোথায় না খুঁজেছি!

— কারণ জানতে পারি?

— বহরমপুর সিনহা লজে থেকে পড়াশোনা করতেন?

— কী হয়েছে তাতে?

— উঁহু। আজ শুধু আমি প্রশ্ন করব, উত্তর দেবেন আপনি। বলুন সিনহা লজে থাকতেন?

— হুম্!

— তাহলে নিশ্চয় ভারতীকে মনে আছে? সেই ভারতী যাকে আশুবাবু গ্রাম থেকে রান্না করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে আপনি গ্রামের সহজ-সরল মেয়েটাকে বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়ে...। মিস্টার রায় কিছু মনে পড়ছে?

— কে তুমি?

— বিশাল। এক মুসলমান মাঝির সংসারে আমার বড়ো হওয়া। যদিও সেটা আমার আসল পরিচয় নয়। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, সারনেম রায়।

— কী বলতে চাইছ তুমি?

— আমি একজন কুমারী মায়ের সন্তান।

— তোমার ব্যভিচারী মায়ের কেচ্ছা আমাকে শোনাতে এসেছ কেন? বাজে কথা শুনে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

— আপনার মতো আমিও একজন বিজনেসম্যান। চব্বিশ ঘন্টায় আঠারো ঘন্টা বিজি থাকি। যেখানে আমার প্রফিট নেই, সেখানে কখনও যাই না। আপনার কাছে ছুটে এসেছি, এত কথা বলছি, এমনি-এমনি? না মহাশয়। একটি পিতৃপরিচয়হীন ছেলের কাছে পিতৃপরিচয় ফিরে পাওয়া কম প্রফিটেবল নয়।

— শাট আপ ননসেন্স! তখন থেকে ভাট বকে যাচ্ছ। দ্যাটস এনাফ! তোমার আর কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। গেট লস্ট। হরি, হরি। কৈলাসবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজার লক খুলতে গেলে বিশাল বাধা দিয়ে বলল, হরিকে ডেকে লাভ নেই মাই ডিয়ার। সে এখন ঘুমোচ্ছে, ঘন্টা দুয়েকের আগে তার ঘুম ভাঙবে না।

— ইউ চিট! ব্ল্যাকমেল করে আমার সম্পত্তি হাতাতে চাইছ। তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

— একথা বলে কৈলাসবাবু ফোন করতে উদ্যত হলে বিশাল এক ঝটকায় রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে আছাড় মারল। ভেঙে খানখান হয়ে গেল সেটা।

— ব্ল্যাকমেল করার ইচ্ছা থাকলে আপনার ছেলেমেয়েদের কিডন্যাপ করিয়েই তা করতে পারতাম। তা করিনি, কারণ আপনার সম্পত্তিতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

— কী চাও তবে?

— স্বীকৃতি।

— কীসের স্বীকৃতি?

— আমি আপনার সন্তান।

— হোয়াট ননসেন্স! আমার কি ছেলেমেয়ে নেই যে তোমার মতো একটা রাস্তার কুকুরকে...। বাড়ি গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা কোরো কোন নরকের কীট তুমি।

— এই সেই নরক। আপনি তার অধীশ্বর। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মায়ের মুখে আপনার নাম শুনেছিলাম। কীভাবে আপনি মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে তার সর্বনাশ করে গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাও বলেছিল মা। প্লিজ আমাকে পুত্র বলে মেনে নিন। আর কোনো প্রত্যাশা নেই আমার।

— এই জন্মে তোমার সাধ পূরণ হবে না।

বিশাল সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বলল, হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে আমি অভ্যস্ত নই। আমার পছন্দের জিনিস, ন্যায্য পাওনা আদায়ের পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে চরম মূল্য চোকাতে হয়। কলার কাঁদি কাটা দেখেছেন কখনও? বেয়াড়া মানুষের গলা আমি সেভাবেই কেটে থাকি। নেহাত মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা নাহলে এতক্ষণ...।

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে বিশাল। সেই সুযোগে কৈলাসবাবু তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালাতে চাইলেন। কিন্তু পেরে উঠলেন না। সামলে উঠে বিশাল ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটানে চিত করে মেঝেয় পেড়ে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসল। তারপর তাঁর হাঁ-মুখে রিভলবারের নল ঢুকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়ে থমকাল। মা শুধু পিতৃপরিচয় আদায়ের অধিকার দিয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে, কোনো অবস্থাতেই যেন কৈলাসবাবুর গায়ে হাত না তোলে।

উঠে দাঁড়াল বিশাল। প্রচণ্ড আক্রোশে মাথা টগবগ করে ফুটছে। চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সামলাতে না পেরে দেয়ালে পরপর কয়েকটা ঘুষি চালিয়ে দিল। তারপর বলল, কাজটা ভালো করলে না কৈলাসবাবু। কীভাবে পাওনা আদায় করতে হয় তা আমার ভালোই জানা আছে। এখন থেকে প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করতে হবে বিশাল নামে তোমার আরও একটি সন্তান আছে। তোমার ব্যাবসা, তোমার সংসার কোনো কিছুই আস্ত রাখব না আমি।

কৈলাসবাবু মিউমিউ করে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। বিশাল তাতে কান দিল না। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সিকিউরিটি তখনও অচৈতন্য হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। তাকে ডিঙিয়ে এসে তরতর করে লোহার গেট বেয়ে রাস্তায় নেমে এল।

চরণদাস দূরে সরে গিয়ে আকন্দ ঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। বিশালকে আসতে দেখে এগিয়ে এল।

— খবর কী গুরু?

— সরাসরি অস্বীকার করে গেলেন।

— তুমি মেনে নিলে?

— বাছাধন এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল।

ততক্ষণে মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাচ্ছে বিশ্ব চরাচর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরোনো হাসপাতালের উলটো দিকে ততোধিক পুরোনো একটি দোতলা বাড়ির উপর তলায় সিনহা লজ। চারটি মাত্র রুম। প্রত্যেক রুমে তিনটি করে বেড। সব মিলিয়ে বারোজন ছেলে থাকে সেখানে। সকলেই বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র।

এক বয়স্ক মহিলা দীর্ঘদিন সেখানে রান্নাবান্নার কাজ করত। কিছুদিন হল সে গত হয়েছে। ছেলেরা নিজেরাই এই ক-দিন পালাক্রমে রান্না করে খেয়েছে। আর পারা যায় না। লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ছেলেরা আশুতোষকে চেপে ধরল, যে করেই হোক তোকে একটা রান্নার লোক জোগাড় করতেই হবে।

আশু বিএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। শহর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তার বাড়ি। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। বেশির ভাগ খেটে খাওয়া গরিব মানুষের বাস সেখানে। খোঁজখবর নিয়ে আশুতোষ জানতে পারে মালপাড়ার অচলা মালের আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে আছে। নাম তার ভারতী। স্বভাব-চরিত্র ভালো, তেমনি পরিশ্রমী।

আশুতোষ অচলা মালকে ধরে ঝুলে পড়ল, কাকি ভারতীকে আমার সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দাও। ভালো মাইনে পাবে, সঙ্গে খাওয়া-পরা ফ্রি। কাজ বলতে দু-বেলা শুধু রান্না করা।

— ভারতী আমার সোমত্ত মেয়ে। ছেলে-ছোকরার পালে থেকে কাজ করতে হবে। না বাবা তুমি অন্য কাউকে দ্যাখো।

— তোমার আশঙ্কা স্বাভাবিক কাকি। ভারতী আমার গ্রামের মেয়ে, আমার বোনের মতো। তার কোনো ক্ষতি হতে দেব না। আমার ওপর ভরসা রাখো।

— জানি তুমি ভালো ছেলে। কিন্তু...

— ভারতীর কোনো ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব আমার। তুমি আর না কোরো না কাকি।

ভারতীর বাবা নেই। ছোটোবেলা থেকেই মায়ের পিছন-পিছন মাঠঘাট করে বেরিয়েছে। স্কুলের দরজা মাড়ায়নি কস্মিনকালে। এর-তার কাছ থেকে পুরোনো জামাকাপড় চেয়ে পরে। প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। মাঝে মাঝে মা ভাঙা কাপে কিছুটা সরষের তেল নিয়ে ঘষে ঘষে মাথার চুলে লাগিয়ে দেয়। তাতে কী! মেয়ের চেহারায় চটক আছে। টান-টান শরীর। পটলচেরা চোখ। নাকটা সামান্য চাপা হলেও মুখশ্রীর সঙ্গে মানানসই।

সেদিনই বিকেলে আশুতোষ ভারতীকে নিয়ে লজে ফিরল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নীচে যে ঘরটা এতদিন আনাজপাতি রাখার জন্য ব্যবহার করা হত, সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা করা হল। গ্রামের মেয়ে, শহরে জীবনযাত্রার কোনো কিছুই তার

জানা নেই। আশুতোষ একটু একটু করে শেখাতে থাকে, কীভাবে চলতে হবে, কীভাবে কথা বলতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাদাবাবুরা খুব ভালো। শুধু কৈলাশ নামের ছেলেটাকে কেমন যেন মনে হয়। তার দৃষ্টিতে কামনার আগুন, আড়ালে দাঁড়িয়ে দেহসৌষ্ঠব ভোগ করে। বিব্রত বোধ করে ভারতী। আশুকে ছেলেটার কথা বলবে ভাবলেও পাছে তাকে ভুল বোঝে এই ভয়ে শেষপর্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে না।

সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দাদাবাবুরা সব খেয়েদেয়ে কলেজে গেছে। ভারতী নিজের ঘরে চিত হয়ে শুয়ে একটি সিনে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। দাদাবাবুরা মাঝে মাঝেই বই কিনে আনে, পড়া হয়ে গেলে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। তারই একটা তুলে নিয়েছে ভারতী। পড়তে পারে না, ছবি দেখে। নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ ছবিগুলো তাকে খুব টানে। এটা অবশ্য তার দোষ নয়, বয়সের দোষ। এই বয়সে ছেলেমেয়ে সকলেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়। কীসে কী হয়, জানার কৌতূহল তাড়া করে প্রত্যেককে।

— ভারতী কী করছিস? হঠাৎ কৈলাসের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে চমকে উঠল ভারতী। ম্যাগাজিন রেখে ধড়মড় করে উঠে বসল।

— দাদাবাবু আপনি কলেজে যাননি?

— গেছিলাম রে, কিন্তু থাকতে পারলাম না। ভীষণ মাথাব্যথা করছে। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। জ্বর আসবে হয়তো। বলতে বলতে কৈলাস ভারতীর ঘরে ঢুকে চৌকির কাছে এসে অনুনয়ের সুরে বলে, মাথাটা একটু মালিশ করে দে না।

— পারব না দাদাবাবু। লোকে দেখলে বদনাম হবে। আপনি এখান থেকে যান। চৌকি থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল ভারতী।

— তবে আমার ঘরে আয়।

ভারতীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কৈলাস তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে উপরতলায় নিয়ে যেতে থাকল। এই মুহূর্তে ঠিক কী করণীয়, কীভাবে কৈলাসের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবে ভেবে কূল পায় না ভারতী। এই সুযোগে ঘরে ঢুকে দরজার খিল এঁটে দিল কৈলাশ। তারপর একটানে বিছানায় পেড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

— দাদাবাবু এ কী করছেন? ছাড়ুন, যেতে দিন আমাকে। তা নাহলে চিৎকার করব। কামড়ে দেব।

কৈলাসকে তখন পশুত্বে ভর করেছে। পাগলের মতো ভারতীর ঠোঁটে-গালে এলোপাথাড়ি চুমু দিচ্ছে। জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে নির্মমভাবে স্তনযুগল মর্দন করছে। ভারতী আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে মুক্ত করার। হাত কামড়ে দেয়, তলপেটে লাথি মারে। তবুও কৈলাসের হাত থেকে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারল না।

মিনিট দশেক বাদে কৈলাস উঠে দাঁড়ালে ভারতী সপাটে তার গালে চড় বসিয়ে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, লম্পট। শয়তান। আশুদা আসুক সব বলে দেব।

কৈলাস বালিশের তলা থেকে একগোছা নোট বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। এই টাকাগুলো এখন রাখ, পরে আরও দেব। সোনার দুল, সোনার চেন কিনে দেব।

— কিছু চাই না আমার। তুমি কেন আমার সর্বনাশ করলে?

— তোকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে ভারতী। যেদিন থেকে তোকে দেখেছি আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। ক-টা দিন চুপ করে থাক। পরীক্ষা হয়ে গেলে মন্দিরে গিয়ে তোর মাথায় সিঁদুর দেব। মা কালীর দিব্যি তোকে ঠকাব না। দেয়ালে টাঙানো কালীমাতার ছবিতে হাত দিয়ে বলল কৈলাস।

সেদিন যদি ঘটনার কথা গোপন না করে আশুতোষকে বলত কিংবা প্রশাসনের দ্বারস্থ হত ভারতী, তাহলে হয়তো জীবন অন্যখাতে বইতে পারত। কিন্তু বিয়ের প্রলোভনে পা দিয়ে সে তা করেনি। আর এই ভুলটাই তার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াল।

ইচ্ছা হলেই কৈলাস আহ্বান করে। আদিম খেলায় মেতে ওঠে দুটি দেহ। পরিণামে যা হবার তাই হল। পরপর দু-মাস ঋতুচক্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় রক্তক্ষরণ হল না। আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতীর মাথায়। কৈলাসকে একান্তে ডেকে বলল, আর দেরি করা ঠিক হবে না। চলো আজই মন্দিরে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলি।

— আর ক-টা দিন ধৈর্য রাখ। সামনের মাসে পরীক্ষা। তারপরেই...

— না! আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না।

— আমার উপর ভরসা নেই তোর?

— সে কথা নয়। আমার পেটে তোমার বাচ্চা এসেছে।

— কী! কিছুক্ষণের জন্য কৈলাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ওটাকে ফেলে দে। খরচাপাতি আমি দিয়ে দেব।

— পেটের সন্তানকে মেরে ফেলতে বলছ? তোমার সঙ্গে মেলামেশা করে অনেক পাপ করেছি। তার ওপর নরহত্যা? আমি পারব না।

— ভারতী অবুঝ হোসনে, কথা শোন। বহরমপুর নার্সিং হোমে আমার চেনাজানা ছেলে আছে। ওখানে গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে নে। একটু থেমে আরও বলল, এখনও আমাদের বিয়ে হয়নি, সমাজ এই সন্তান মেনে নেবে না।

— তোমার চালাকি আমি বুঝি না ভেবেছ? বাচ্চা নষ্ট করলেই তুমি আমাকে অস্বীকার করবে। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দেব না। আশুদা ফিরুক, আজই থানায় তোমার নামে কেস করব।

থানা-পুলিশের কথায় কৈলাস ঘাবড়ে গেল। ভারতীর হাতদুটো চেপে ধরে বলল, লক্ষ্মীটি রাতটা চুপ করে থাক। কাল সকালেই তোকে নিয়ে মন্দিরে যাব। তারপর ভারতীর হাতদুটো নিজের মাথায় রেখে বলল, কথা দে আশুকে কিছু বলবি না।

সকালে উঠে কৈলাসের খোঁজ পাওয়া গেল না। কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়েছে। ভারতী আশুতোষের পায়ে ধরে কেঁদে ফেলল, এখন আমার কী হবে?

— গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলে পড়গে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেগে যা। বদমাশ মেয়ে, তোর জন্য আমি গ্রামে মুখ দেখাতে পারব না। কী জবাব দেব অচলা কাকিকে?

— আশুদা, ওর খোঁজ নাও। কথা দিয়েছে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে।

— ওরে পাগলি, তাই যদি করবে তবে পালাল কেন? বর্ধমানের কোন-এক গ্রামে তার বাড়ি, গ্রামের নামটাও জানা নেই। অন্ধকারে কোথায় খুঁজব?

আগুন আর নষ্ট মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। উভয়ই ভয়ংকর বিধ্বংসী। যে কোনো সময় জ্বলে উঠে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে সক্ষম। ছেলেরা ভারতীকে আর রাখতে চাইল না। লজ মালিক বলে গেলেন সন্ধ্যায় এসে যেন আমি তাকে না দেখি। আশু নিরুপায়, ভারতীই তার শক্তি লোপ পাইয়ে দিয়েছে। জবাব দিতেই হল। আশু বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইলে সে বলল, তুমি আর এসবে জড়িয়ো না দাদা। আমাকে আমার উপর ছেড়ে দাও।

লজ থেকে বেরিয়ে গির্জার মোড়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ভারতী। তারপর হঠাৎ করে গঙ্গাব্রিজের দিকে দ্রুতবেগে হাঁটতে শুরু করল।

আবদুর রহমান মাঝি, পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধ। গঙ্গাবক্ষে মাছ শিকার করে সংসার নির্বাহ করে। সেদিনও সে মাছ শিকার করতে বেরিয়েছে। হঠাৎ একটা মেয়েকে ব্রিজের উপর থেকে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিতে দেখে চিৎকার করতে থাকল। তার ডাক শুনে কাছাকাছি যারা ছিল দ্রুত এসে উপস্থিত হল। সবাই মিলে অচৈতন্য ভারতীকে ধরাধরি করে ডাঙায় তুলল।

সকলের চেষ্টায় আধঘন্টা বাদে জ্ঞান ফিরে পেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল ভারতী, কেন তোমরা বাঁচালে আমাকে?

— আত্মহত্যা মহাপাপ মা।

— কিন্তু আমি যে পাপ করছি, তা আর বয়ে বেড়াতে পারছি না বাবা। দয়া করে তোমরা গলা টিপে মেরে ফ্যালো আমাকে।

— আত্মহত্যা সমস্যা সমাধানের পথ নয়রে মা। ধৈর্য রাখ, সমস্যা যিনি দিয়েছেন, সমাধানও তিনিই করবেন।

— কিন্তু বাবা আমি যে নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না।

— কী এমন অপরাধ করেছিস মা? সব খুলে বল আমাকে।

— শুনলে তোমরাও আমাকে ঘৃণা করবে। আপশোশ করবে কেন এই মেয়েকে বাঁচালাম।

— তবে থাক কিছু বলতে হবে না। রহমান মাঝি ভারতীকে বাড়িতে নিয়ে এল। সংসারে এক স্ত্রী ছাড়া তার কেউ নেই। শেষ বয়সে একটা মেয়ে পেয়ে বুড়ি খুব খুশি। কিন্তু যাকে নিয়ে খুশির মহড়া সে যে ভালো নেই। মানসিক পীড়া তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করে না। সবসময় গুম মেরে বসে থাকে আর কী যেন ভাবে।

সময় আপন খেয়ালে বয়ে চলে। দিন আসে দিন যায়, মাস আসে মাস যায়। ধীরে ধীরে ভারতীর পেট মোটা হতে থাকে। ছেলে না মেয়ে হবে এই নিয়ে তিনজনে জলঘোলা করে। ভারতী চায় ছেলে হোক। ছেলে চেয়ে সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে। মা-ও মেয়ের পক্ষে। সে পিরের মাজারে মানত করেছে নাতি হলে একটা মোরগ দেবে। রহমানের পছন্দ মেয়ে। যে ঘরে মেয়ে জন্মায় সে ঘরে আল্লার রহমত বর্ষিত হয়।

নির্দিষ্ট দিনে ব্যথা উঠলে ভারতীকে মাতৃসদনে নিয়ে গেল বুড়োবুড়ি। ভোর বেলায় যখন মসজিদে মসজিদে ফজরের আজান ধ্বনিত হচ্ছে, ভারতীর কোল আলো করে জন্ম নিল এক পুত্রসন্তান। নাতির মুখ দেখে বুড়ির খুশি ধরে না। সে বুড়োকে ডেকে নির্দেশ দিল, আজই একটা মোরগ কিনে মাজারে দিয়ে এসো।

রহমান মাঝি নাতির নাম রেখেছে বিশাল। কেউ কী জানত এই ছেলেই একদিন রাজ করবে বহরমপুর শহরে। মুকুটহীন বাদশা হয়ে শাসন করবে বাংলা-বিহার-ওড়িশার অন্ধকার জগৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেখতে দেখতে বিশ-বাইশটা বছর কেটে গেছে। বিশাল এখন তরতাজা যুবক। ছ-ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা, চওড়া ছাতি। লম্বাটে মুখমণ্ডল, বাজপাখির মতো চোখ, খরগোশের মতো কান। তীক্ষ্ণ নাকের নীচে একফালি সরু গোঁফ। মাথায় একঝাড় কোঁকড়ানো চুল। কথা বললে মনে হয় প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

ততদিনে রহমান মাঝি এন্তেকাল করেছে। বৃদ্ধা বয়সের ভারে ন্যুব্জ, বিছানা তার স্থায়ী আস্তানা। ভারতী সংসারের কর্ত্রী এবং একমাত্র রোজগেরে। মেয়েমানুষ নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারে না। পরের ঘরে কাজ করতে গিয়ে আর-একটা কৈলাসের

খপ্পরে পড়বে না কে বলতে পারে? অতএব সে পথ মাড়ানোর সাহস হয় না। বস্তির ক-টা মেয়ে বাজারে কাঁচা আনাজপাতির কারবার করে। ভারতী তাদের সঙ্গে লেগে গেল। রোজগারপাতি মন্দ হয় না। সংসার খরচ চালিয়ে কিছুট উদ্‌বৃত্ত হয়। ব্যাংকে একটা রেকারিং অ্যাকাউন্ট খুলেছে, অল্প হলেও মাসে মাসে সঞ্চয় করে।

বিশাল লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। মা তাকে লেখাপড়ার বাইরে কোনো কাজ করতে দেয়নি। কলেজের পরীক্ষা শেষ হবার পর সে মাকে বলল, তুমি আর বাজারে যাবে না। এবার আমি রোজগার করব, তুমি শুধু রাঁধবে আর খাবে।

— বাজারে সবজি বেচার জন্য তোকে লেখাপড়া শেখাইনি খোকা।

রহমান যে বছর মারা যায়, তার আগের বছর বিশালকে বস্তির প্রাথমিক স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল। ফর্ম পূরণ করার সময় প্রধান শিক্ষক ছাত্রের পিতৃপরিচয় জানতে চাইলে সে নিজের নাম বলে। সেই পরিচয়েই বিশাল শিক্ষাজীবন শেষ করেছে। লেখাপড়ায় নেহাত খারাপ ছেলে নয়। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। স্নাতকস্তরে হিসাবশাস্ত্রে অনার্স ছিল। পরীক্ষা খারাপ দেয়নি, ফার্স্ট ক্লাস আসবেই।

সে আশাবাদী একটা ভালো চাকরি জোগাড় করতে পারবে। কিন্তু যতদিন চাকরি হচ্ছে না হাত-পা গুটিয়ে থাকবে আর বসে বসে মায়ের রোজগারে গিলবে তা হয় না। যে কোনো কাজ করতে সে প্রস্তুত। মায়ের কথার উত্তরে বলল, কোনো কাজই ছোটো নয় মা।

কলেজে পড়াকালীন সময়ে ছাত্র-রাজনীতি করতে গিয়ে স্থানীয় এমএলএ-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরতে হল। এমন ভান করলেন যেন চেনেন-ই না।

হাল ছাড়ে না বিশাল। কাজের সন্ধানে ঘুরতে থাকে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে। একদিন এক বেসরকারি কারখানার অফিস থেকে ফেরার পথে মোহন সিনেমার কাছে ফটিকদার চায়ের দোকানে এসে বসল। পরিচিত দোকানদার। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সপ্তাহে একদিন মুভি দেখা প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল। চা-টা খেলে এই দোকানেই আসত। সেই সূত্রে পরিচয়। বিশালকে দেখেই দোকানদার বলল, আরে বিশাল ভাই যে। একা কেন, বন্ধুরা কই?

— আজ মুভি দেখতে আসিনি দাদা। একটা কাজে এদিকে এসেছিলাম।

বিশালকে লাঠি নামে এক জাতীয় মুখরোচক নোনতা বিস্কুট আর হালকা মিস্টির গাঢ় দুধের চা এগিয়ে দিয়ে সে পুনরায় বলল, ক-দিন থেকে বাজারে তোমার মাকে দেখছি না। শরীর খারাপ বুঝি?

— না দাদা। আমিই মাকে বাজারে বসতে মানা করেছি।

— কেন?

— মা অনেক কষ্ট করেছে জীবনে। এবার আমি তার জন্য পরিশ্রম করব।

— বাহ খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। কিন্তু চাকরি-বাকরির যা বাজার তাতে খুঁটির জোর না থাকলে হালে পানি পাওয়া কঠিন।

— ঠিক বলেছেন দাদা। যত সহজে মাকে কাজে যেতে বারণ করেছি, কাজ পাওয়া ততটা সোজা নয় এখন বুঝছি।

— আমি বলছিলাম কি যতদিন ভালো কিছু না হচ্ছে এক কাজ করতে পারো। পুঁজি বেশি লাগবে না, পরিশ্রমও তেমন নেই। কিন্তু লাভদায়ক।

— যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত আছি ফটিকদা। চা পান শেষে মাটির ভাঁড়টা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বলল বিশাল।

— হাতে টাকা আছে কিছু?

— শ-দেড়েক।

— ওতেই হবে। কাউন্টার খোলার সময় হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাসের ক-টা টিকিট কেটে রাখো।

তখন টিভি-মোবাইলের এত রমরমা শুরু হয়নি। হলে মুভি দেখার জন্য শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মানুষ আসত দল বেঁধে। তেমন মুভি হলে টিকিট পাওয়ার জন্য মানুষ তিনগুণ পয়সা খরচ করতে দু-বার ভাবত না। ফটিকদার প্রস্তাব মনে ধরল বিশালের। কপাল ঠুকে লাইনে নেমে পড়ল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চরণদাস বাল্যবন্ধু। কাজকাম কিছু করে না, সবসময় পিছনে ঘুর-ঘুর করে। ব্যাবসায় তার বিনিয়োগ শূন্য। তবুও লভ্যাংশের ফিফটি পারসেন্ট তাকে দেয়। সে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে, ভালোবাসার টানে।

সেদিন নাইট শোয়ের টিকিট কেনাবেচা শেষ করে ফটিকদার দোকানে বসে হিসাব কষছিল বিশাল। চরণ এসে বলল, গুরু একটা লোক তোমাকে ডাকছে।

— চিনিস লোকটাকে?

— না। গাড়ি নিয়ে এসেছে।

— স্ট্রেঞ্জ! আমি আবার কবে থেকে ভিআইপি হলাম? টাকা গুছিয়ে পকেটে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাল। — চল দেখে আসি আইটেমটা কে?

সিনেমা চত্বরের বাইরে পাকা রাস্তার একপাশে একটি ব্রাউন কালারের মারুতি

৮০০ দাঁড়িয়ে। একটা লোক গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে। ঢ্যাঙা-পাতলা গড়ন। মুখে চাপদাড়ি। পরনে প্যান্ট-শার্ট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চরণ তার দিকে ইঙ্গিত করলে বিশাল এগিয়ে গেল।

—ইয়েস বলুন?

— তোমার নাম বিশাল?

— হুম্! আপনি?

— বস ডেকেছেন তোমাকে।

— কে তিনি?

— গেলেই বুঝতে পারবে। ওঠো গাড়িতে। এ-কথা বলে লোকটা গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

— এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমি আপনার বসের কেনা গোলাম। উনি ডাকলেন আর আমি হাজির হয়ে গেলাম। তামাশা আর কী!

— অবিনাশ চৌধুরীকে চেনো না তাই এমন কথা বলছ। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে পারতেন।

— ইজ ইট! চরণ চল তো দেখে আসি কে ওই মহাপুরুষ।

চরণ ইশারায় একদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার কানে কানে বলল, গুরু অবিনাশ চৌধুরী মাফিয়া ডন। গাঁজা, চরস, কোকেন, হেরোইনের কারবার করে। তার কাছে না যাওয়াই ভালো।

— আমরা তার কোনো ক্ষতি করিনি। ভয় পাব কেন? গটগট করে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল বিশাল। অগত্যা চরণকেও উঠতে হল।

কয়েক মিনিটের রাস্তা। লালদিঘির পশ্চিম পাড়ের গলিরাস্তা ধরে কিছুটা এসে একটা দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে লোকটা নেমে দাঁড়াল। বিশালের বুঝতে অসুবিধা হল না গন্তব্যে পৌঁছেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তারাও গাড়ি থেকে নেমে এল।

— এসো আমার সঙ্গে। ঢ্যাঙা-পাতলা লোকটা বিশালদের নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। ছিমছাম, সাজানো-গোছানো বাড়ির ভিতরটা। বারান্দায়, জানালার করিডরে, সিঁড়ির চাতালে মাটির টবে নানা জাতের ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। নাম না জানা একটি লতা গ্রিল ধরে উপরে উঠে গেছে। বারান্দায় লম্বা একটি কাঠের বেঞ্চ পাতা আছে। লোকটা চরণকে বেঞ্চে বসতে বলে বিশালকে ভিতরে যেতে ইশারা করল।

ঘরের মাঝামাঝি পজিশনে একটি টেবিল রাখা আছে। টেবিলের উপর একটা ছাইদানি, টেলিফোন সেট, ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে পাঁচ-ছটা বহুল প্রচলিত দৈনিক খবরের কাগজ। দুই প্রান্তে দু-খানা চেয়ার। মাথার উপর একটি পাখা স্লো মোশানে পাক খাচ্ছে।

বিশাল এ-প্রান্তের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে চমকে উঠল। ঠিক সামনেই একটা দরজা। তার মানে ঘরের ভিতরে ঘর, গোপন কুঠুরি। দরজাটা এমনভাবে বসানো হয়েছে হঠাৎ করে কারও পক্ষে অস্তিত্ব টের পাওয়া কঠিন। নেহাত ভিতরে যারা আছে, অসাবধানে ঠিকঠাক পাল্লা টেনে দেয়নি তাই বিশালের চোখে ধরা পড়ে গেছে।

টেবিল থেকে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র আজকের সংস্করণটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে মেলে ধরল বিশাল। তারপর খোলা দরজার ফাঁক গলে এমনভাবে গোপন কুঠুরির অন্দরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, কেউ দেখলে ভাববে খবরের কাগজ পড়ছে। কিন্তু সে যা দেখল তাতে ভিরমি খাবার জোগাড়। চক্ষু চড়কগাছ। ও ঘরে রাখা ড্রেসিং আয়নায় জ্বলজ্বল করছে নগ্ন নারীদেহের পৃষ্ঠদেশ।

মাস তিনেক আগে মোহন সিনেমায় একটি হলিউডি হরর মুভি প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই ছবিতে নায়িকাকে বার কয়েক সম্পূর্ণ নগ্ন হতে দেখা যায়। কিন্তু চোখের সামনে...। বিশালের কল্পনাতেও ছিল না এখানে এসে এমন দৃশ্য অবলোকন করতে হবে। স্বভাবত সে খানিকটা আপসেট হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মাথা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

— হাই বিশাল। এমন সময় গোপন কুঠুরির দরজা ঠেলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। একমাথা কাঁচাপাকা চুল, ঠোটের নীচে গোঁফের অবস্থাও তদ্রূপ। ঘোলাটে চোখ। বিশাল অনুমান করল লোকটির বয়স ষাটের কাছাকাছি।

ভদ্রলোক আকণ্ঠ মদ্যপান করেছেন। কাছে আসতে মদের কটু গন্ধ বিশালের নাসারন্ধ্র ছুঁয়ে গেল। টলতে টলতে কোনোরকমে এসে টেবিলের ওপারের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন তিনি।

— কেন ডেকেছেন আমাকে?

বিশালের কথার উত্তর দিলেন না তিনি। টেবিলের ড্রয়ার টেনে কিছু খুঁজতে লাগলেন। না পেয়ে কাউকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে বললেন, ঝুমা সিগারেটের প্যাকেটটা বোধহয় ওঘরে ফেলে এসেছি। প্লিজ দিয়ে যাও ডার্লিং, লাইটারটাও দিয়ো।

তৎক্ষণাৎ ওঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে সিগারেটের প্যাকেট, গ্যাস লাইটার। বিশালের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সেই মেয়ে, যার নগ্ন পৃষ্ঠদেশ কিছুক্ষণ পূর্বে আয়নায় ধরা পড়েছিল। তাড়াতাড়িতে শাড়ির একাংশ নিম্নাঙ্গে জড়িয়ে বাকিটা বামহাতে ধরে রেখেছে। ব্লাউজের উপরের দুটো বোতাম খোলা। উন্নত বক্ষযুগল সুযোগ পেয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বেখেয়ালে বিশালের চোখ মেয়েটির বুকে আটকে গেল।

— কীহে, হাঁ করে কী দেখছ?

ভদ্রলোকের কথায় সংবিত ফিরে পেল বিশাল। ঘটনার অভিঘাতে লজ্জায়

আড়স্ট হয়ে পড়ল সে। চট করে তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। ততক্ষণে ঝুমা হাতের জিনিসগুলো টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ওঘরে চলে গেছে।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বললেন, শোবে ওর সঙ্গে?

— কী!

— বলছি, উইদাউট মানি আ পারসান ইজ ভ্যালুলেস। টাকা না থাকলে তোমার কোনো মূল্য নেই।

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে দিয়ে লাইটার জ্বালানোর চেষ্টা করতে লাগলেন ভদ্রলোক। কিন্তু অ্যালকোহলের প্রভাবে পেশিশক্তি শিথিল হয়ে পড়ায় হাতে জোর পাচ্ছেন না। বিশাল তার হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করল। থ্যাংকস জানিয়ে তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিলেন। তারপর একমুখ সাদা ধোঁয়া নির্গত করে বললেন, সুন্দরী যুবতিরা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে। আমার সঙ্গে রাত কাটায়। কেন জানো? ক্ষণিকের জন্য থেমে কাতলা মাছের মতো এক ঢোক হাওয়া গিলে তিনি পুনরায় বলতে থাকলেন, অবিনাশ চৌধুরী বুড়ো ঘোড়া। ওর মতো যুবতির যৌনক্ষুধা মেটানোর শক্তি আমার নেই। তবু আমার ডাকে ছুটে আসে কারণ আমার টাকা আছে। তুমি ডাকো, যাবে না।

এই ক-টা কথা বলতে গিয়ে তিনি নেতিয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত কুকুরের মতো জিভ বার করে হাঁপাচ্ছেন। বেচারা! টাকার জোরে বেহিসেবি জীবনযাপন করতে গিয়ে শরীরটাকে শেষ করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় কোনোদিন প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাবে টের পাবেন না।

ও চিন্তা ওর নিজের। আমি কেন মাথা ঘামাতে যাচ্ছি? মনে মনে শব্দ ক'টা উচ্চারণ করে বিশাল ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলল, আমাকে কেন ডেকেছেন বললেন নাতো?

— ও ইয়েস! আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই।

— বাট হোয়াই? আপনি আমার আত্মীয় নন, পূর্ব পরিচিতিও নেই। তাছাড়া কোনোদিন আপনার কাছে কাজ চাইতে আসিনি। তাহলে...

— সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে ক-টাকা ইনকাম করো? দিন শেষে পাঁচশো-সাতশো? আমার হয়ে কাজ করো। বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্স সব হবে।

— সরি মিস্টার চৌধুরী। আমার অত চাহিদা নেই। এই বেশ আছি। গুড নাইট। উঠে দাঁড়াল বিশাল।

— জাস্ট আ মিনিট। অর্ধমৃত সাপ যেমন খোঁচা খেয়ে ফোঁস করে ওঠে, তেমনি অবিনাশ চৌধুরী চকিতে গর্দান খাড়া করে বিশালের দিকে তাকালেন। নেতিয়ে পড়া ভাব নেই, কথাও জড়াচ্ছে না। অ্যাসট্রেতে সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে দিয়ে বললেন, দিন সাতেক আগে একটি ছেলেকে তুমি বেধড়ক পিটিয়েছ। ছেলেটা এখন নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

— বিশ্বাস করুন আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনি। ওই-ই...। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল বিশাল।

অবিনাশ চৌধুরী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ছেলেটার নাম অশোক। আমার হয়ে কাজ করত সে। তুমি তার তলপেটে আঘাত করেছ, ইউরিন ব্যাগ ফেটে গিয়ে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোনো সময় তার মৃত্যু হতে পারে। ও মারা গেলে তুমি হবে মার্ডার কেসের আসামি। বিচারে তোমার যাবজ্জীবন জেল অথবা ফাঁসির সাজা হতে পারে।

— স্যার!

— আমার দলে নাম লেখালে পুলিশ তোমাকে ছুঁয়েও দেখবে না। এখন তোমার মরজি...।

— দ্যাটস ব্ল্যাকমেল।

— সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হয় ব্রাদার। আমি জোর করব না। দরজা খোলা আছে, 'না' করে দিয়ে চলে যেতে পারো আবার হাত মেলাতেও পারো।

দীর্ঘদিন বাদে মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের মুভি মোহন সিনেমায় রিলিজ করেছে। প্রত্যেকটি শো-ই হাউসফুল যাচ্ছে। সেদিনও ম্যাটিনি শোয়ে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। দশ টাকার টিকিট পঁচিশ টাকায়, পনেরোর গুলো ষাট-সত্তরে কাটছে। একটা ছেলে পনেরো টাকার দু-খানা টিকিট নিয়ে টাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সেখান থেকে বচসার সূত্রপাত। একসময় ছেলেটা মা তুলে গালাগালি দিলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে বিশাল। সজোরে লাথি মারে তার তলপেটে। সে যে এতটা জখম হয়েছে বুঝতে পারেনি।

অসহায় বোধ করে বিশাল। সাপের ছুঁচো গেলার মতো পরিস্থিতি। 'হ্যাঁ' বলতে বিবেকে বাঁধছে, 'না' বললে নিস্তার নেই। অজান্তে অবিনাশ চৌধুরীর জালে জড়িয়ে গেছে। অনেক ভাবনাচিন্তা করে মুখ খুলল, কী করতে হবে আমাকে?

— জানো হয়তো আমার ড্রাগসের কারবার। কোকেন, গাঁজা, চরস, হেরোইন নিয়ে ওঠাবসা। আপাতত তুমি মাল ডেলিভারির কাজ করবে।

— পার ডেলিভারিতে কত টাকার মাল লেনদেন হয়?

— মোর দ্যান টোয়েন্টি ফোর লাখ।

— আমি কী পাব?

তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর না দিয়ে অবিনাশ চৌধুরী সরাসরি বিশালের চোখের দিকে তাকালেন। বিশালও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না। চোখে চোখ রেখে বলল, আমি আপনার হয়ে কাজ করব। তবে আমার দুটো শর্ত আছে।

— নাম্বার ওয়ান?

— ডেলিভারি মূল্যের টেন পারসেন্ট আমাকে দিতে হবে।

— তুমি তো বড়ো ত্যাঁদোর ছেলে। যেই শুনলে মোটা টাকার লেনদেন হয়, অমনি হাঁ বড়ো করে বসলে।

— গোবর জলে নামতে হবে যখন তখন শুধু পা ডোবাব কেন? তাছাড়া আপনি গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্সের কথা বলছিলেন। দু-পাঁচ হাজার টাকা রোজগার দিয়ে কি তা সম্ভব?

— হুম! তোমার দ্বিতীয় শর্ত? অবিনাশবাবু আবার একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে লম্বা টান দিলেন। তারপর প্যাকেটটা বিশালের দিকে এগিয়ে দিলেন। বিশাল ধূমপান করে না জানিয়ে বলল, সরাসরি আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে। আপনার কোনো লোক মাতব্বরি করতে এলে আমি শুনব না।

— লাইনে নতুন এসেছ, কারবারের আটঘাট বোঝো না। কারও না কারও সাহায্য তো নিতেই হবে।

— আপনি ডিরেকশন দেবেন, বাকিটা আমি সামলে নেব।

— কেন জানি না তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। এসো দু-জনে মিলে ড্রিংক করি, বিদেশি ওয়াইন।

— সরি স্যার। মদ্যপানে আমি অভ্যস্ত নই।

— সিগারেট-মদ খাও না তুমি কেমন পুরুষ হে? সুন্দরী যুবতিদের দেখে ফিলিংস আসে তো?

— এগুলোর সঙ্গে কি কাজের কোনো সম্পর্ক আছে?

— হয়তো নেই। কিন্তু...। ঝুমা। ঝুমা।

ডাক পেয়ে ছুটে এল ঝুমা। ও আসতে দামি পারফিউমের সুমিষ্ট সুবাসে ঘর ম ম করে উঠল। চানটান করে সে এখন রীতিমতো ভদ্রমহিলা। পরনে অরেঞ্জ কালারের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ। কপালে সেম কালারের টিপ। ঠোঁটে হালকা বাদামি রঙের প্রলেপ। সত্যিই রূপসি মেয়েটা।

— কিছু দেব? অবিনাশবাবুকে লক্ষ্য করে বলল সে।

— নার্সিংহোমে গিয়ে অশোকের সঙ্গে দেখা করো। বলো সে যেন রাত বারোটায় নার্সিংহোম থেকে পালায়। খবর আছে পুলিশ রেড করবে ওখানে।

ঝুমা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে বিশালের দিকে এক ছটাক হাসি ছুড়ে দিয়ে গেল। প্রতিদানে বিশালও ঠোঁট চওড়া করল।

— ও গড পৌনে দশটা বেজে গেছে! আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে। সোমনাথ। সোমনাথ।

যে লোকটা বিশালদের সিনেমা হল থেকে নিয়ে এসেছিল সে ঘরে ঢুকল। অবিনাশবাবু তাকে বললেন, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো।

— বলছি স্যার।

ক্রেডেল থেকে রিসিভার তুলে নাম্বার ডায়াল করতে গিয়ে তিনি খেয়াল করলেন সোমনাথ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্ত হলেন তিনি। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, কী হল তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

— স্যার অশোককে দেখতে যাব? কতদিন দেখিনি।

— কোনো দরকার নেই। একটু থেমে আরও বললেন, বিশাল এখন থেকে এখানকার লেনদেন মেনটেন করবে। ওকে সব রকম হেল্প করবে।

— অশোকের কী হবে স্যার?

— নো মোর কোয়েশ্চেন। যা বলছি তাই করো।

সোমনাথ আর কিছু বলার সাহস পেল না। ভীত বিড়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। অবিনাশবাবু টেলিফোন সেট টেনে নিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেন। কিছুক্ষণ বাজার পর ওপ্রান্ত থেকে কল রিসিভ করা হলে তিনি সাড়া দিলেন, গুড ইভিনিং গোলদারবাবু। আমাদের থাকা না-থাকা দুই সমান মশাই। এই বেশ আছি, আপনার সঙ্গে কথা বলছি। হঠাৎ করে এসে দুটো বুলেট বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন বুকে। ব্যাস, অবিনাশ চৌধুরী ছবি হয়ে গেল। হা হা হা। বাই দ্য ওয়ে, কাজের কথায় আসি। সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন ইনস্পেক্টর রণজিত মালাকারের খুনি কে। হ্যাঁ। ওর নাম অশোক। পেটে ইনজুরি নিয়ে গীতা নার্সিংহোমে ভরতি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। খবর আছে আজ রাত বারোটার সময় ও নার্সিংহোম থেকে পালাবে। অ্যারেস্ট করবেন কী মশাই, সোজা মর্গে পাঠিয়ে দিন। আপনাদের আবার গ্রাউন্ডের অভাব? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, গুন্ডামি, রাজনৈতিক ক্যাচাল, কোনো একটায় ফেলে দিলেই হল। ওকে, বাই।

রিসিভার ক্রেডেলে রেখে অবিনাশবাবু আবারও একটা সিগারেট ধরালেন। পরপর কয়েকটা টান দিয়ে চোখ বন্ধ করে মিনিট কয়েক নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলেন। তারপর বললেন, ছেলেটা খুব কাজের ছিল তবু ওকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। বিটার অ্যালোন দ্যান আ ডেভিল কোম্পানি। অশোকের কাজকর্মে বেইমানির গন্ধ পাচ্ছিলাম। একমাসও হয়নি এক প্যাকেট হেরোইন গায়েব করেছে। বলে কিনা পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে। এই সেদিনও আবার আড়াইশো গ্রাম কোকেন ঝেড়েছে। দিনে দিনে ওর লোভ বেড়ে যাচ্ছিল। একটা কথা মনে রেখো বিশাল, বেইমান মানুষ হিংস্র জানোয়ারের থেকেও ভয়ানক। কখনোই তাদের প্রশ্রয় দেবে না।

— আপনার কথা মনে রাখব স্যার। বিশালের বুঝতে অসুবিধা হল না অশোককে সরিয়ে দেবার পাশাপাশি তাকেও হুমকি দিয়ে রাখলেন অবিনাশবাবু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন সকাল ন-টায় অবিনাশ চৌধুরীর ডেরায় উপস্থিত হল বিশাল। ঝুমা-সোমনাথ বারান্দায় বসে নীচু গলায় নিজেদের কথা বলছে। বেশ উদ্‌বিগ্ন ও চিন্তিত দেখাচ্ছে তাদের। বিশাল সুপ্রভাত জানালে কেউ রেসপন্স দিল না।

এমন সময় টেলিফোনের ঘন্টি বাজার শব্দ হল। ঝুমা ভিতরে গিয়ে রিসিভ করল—গুড মর্নিং স্যার। না স্যার, পালাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়েছে। খুব খারাপ লাগছে। এতদিন একসঙ্গে কাজ করলাম। হ্যাঁ এসেছে। আমি যাব ওর সঙ্গে? ওকে।

বিশাল আশ্চর্য না হয়ে পারল না। গতরাতে ও এখান থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছে অশোক সকালের মুখ দেখবে না। এরা কি কিছুই টের পায়নি? অবিনাশ চৌধুরী তোমাকে হাজার সেলাম। তুমি শুধু হিংস্র রয়েল বেঙ্গল টাইগার নও, ধূর্ত শেয়ালও বটে।

— বিশাল, আর য়ু রেডি? বলল ঝুমা।

— ইয়েস।

— এসো আমার সঙ্গে।

আগে-পিছে হেঁটে গিয়ে অবিনাশ চৌধুরীর চেম্বারে প্রবেশ করল দুজনে। ঝুমা বসল ওপ্রান্তের চেয়ারে, গত সন্ধ্যায় যে চেয়ারটায় অবিনাশবাবু বসেছিলেন। এপারে বিশাল।

— মাল নিয়ে তোমাকে এখনই রঘুনাথগঞ্জ যেতে হবে। বাংলাদেশের পার্টি গাড়িঘাটে নৌকা নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে।

— আমি তাকে চিনব কীভাবে? এনি আইডেনটিটি?

— ওর পরনে থাকবে বড়ো চেকের লুঙ্গি, সবুজ রঙের হাতকাটা ফতুয়া। গলায় লাল খুদি চেকের গামছা। পান চিবোবে সে। তুমি নৌকায় উঠলে সে বলবে, নৌকা রিজার্ভ আছে। উত্তরে তুমি বলবে, সবই তার ইচ্ছা।

— তারপর?

— মাঝি স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে দেবে। ভাসতে ভাসতে নির্জন এলাকায় পৌঁছে তুমি তার হাতে মালের প্যাকেট দেবে। বিনিময়ে সে তোমাকে দেবে টাকা-ভরতি ব্যাগ।

— চরণ আমার সঙ্গে থাকবে তো?

— কে চরণ?

— আমার বন্ধু। অবিনাশবাবুকে আমি তার কথা বলেছি। তিনি কিছু বলেননি তোমাকে?

একথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঝুমা বলল, তুমি নতুন। কিছুদিন আমি তোমার গাইড হিসাবে থাকব। সব চেনাবোঝা হয়ে গেলে তখন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ো, আপত্তি থাকবে না।

— সে না হয় হল। কিন্তু তুমি, আই মিন একটা মেয়ে...?

— মেয়েতে তোমার এলার্জি আছে বুঝি?

এই কয়েক ঘণ্টায় বিশাল বুঝে গেছে অবিনাশবাবুর অ-বর্তমানে ঝুমা এখানকার বস। সোমনাথ কাঠের পুতুল ছাড়া কিছু নয়। আর কথা বাড়াল না সে।

সোমনাথকে ডেকে মাল আনতে বলল ঝুমা। খানিক বাদে সে একটা ছোটো থলে এনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ঝুমা থলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, পঁচিশ লাখ টাকার মাল আছে। সাবধান, এতটুকু ভুলচুক হলে গর্দানে মাথা থাকবে না। ঝুমা এমনভাবে বিশালের গলার কাছে হাত চালাল যেন ছুরি চালাচ্ছে। অতঃপর বিশালকে চমকে দিয়ে বলল, শার্ট খোলো।

— হোয়াট?

— হ্যাঁ, শার্টটা খুলে থলেটা কোমরে জড়িয়ে নাও। তারপর...

— ওহ! তাই বলো। আমি ভাবলাম...। বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে উঠে দাঁড়াল বিশাল। দ্রুত হাতে শার্টের বোতাম খুলে থলেটা কোমরে বেঁধে নিল। তারপর বোতাম লাগাতে লাগাতে বারান্দায় চলে এল। ততক্ষণে চরণ এসে পৌঁছেছে। তাকে সোমনাথের সঙ্গে থাকতে বলে বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসল।

একটু বাদে ঝুমা এসে ড্রাইভারের আসনে বসে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল। পাকা হাত মেয়েটার। দ্রুত গতিতে গির্জা মোড়ে পৌঁছে বাঁয়ে টার্ন নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে ছুটতে থাকল।

— বাংলাদেশের পার্টি রঘুনাথগঞ্জে কেন? কাছাকাছি জলঙ্গী কিংবা লালগোলা থেকে ডেলিভারি নিলেই পারে। গঙ্গাব্রিজ পেরিয়ে রাধার ঘাট ঢোকার আগে মুখ খুলল বিশাল।

— বস অতিরিক্ত কৌতূহল পছন্দ করেন না। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, যতটুকু বলা হয়েছে নিঃশব্দে করে যাও। গিয়ার চেঞ্জ করতে করতে উত্তর দিল ঝুমা।

— আমরা দুজনেই অবিনাশবাবুর হয়ে কাজ করছি। এক অর্থে আমরা কলিগ। অজানা বিষয়ে...

— থামো। আমার পজিশন অনেক উপরে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বিশাল হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন এ লাইনে এলে? দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের মেয়ে, শিক্ষাদীক্ষাও আছে পেটে। সুন্দরী, বয়স অল্প। বিয়ে-থা করে সংসারী হলেই পারতে।

— তুমি যে কারণে লাইনে এলে, মনে করো আমিও তাই। গাড়ি-বাড়ি-ব্যাংক ব্যালান্স।

— বাড়ির লোক, আই মিন তোমার বাবা-মা জানে?

— তাদের জানার কথা নয়। অনেক আগেই তারা ইহলোক ছেড়ে গেছে। তবে আমার স্বামীদেবতা সব জানে।

— কতটুকু? অবিনাশবাবুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছ সেটাও কি?

আকাশের সূর্যকে নেমে এসে মাটির কোলে গড়াগড়ি খেতে দেখেও হয়তো এতটা অবাক হত না বিশাল, যতটা হল ঝুমা যখন বলল সব জানে তার স্বামী।

— হোয়াট ননসেন্স!

ঝুমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল না। কয়েক মিনিটের বিরতি শেষে বলল, নতুন বিয়ে। তখনও গা থেকে কাঁচা হলুদের গন্ধ যায়নি। এক সন্ধ্যায় সিনেমায় যাবার নাম করে সে আমাকে অবিনাশ চৌধুরীর বাংলোয় নিয়ে এল। ভেবেছিলাম ওর কোনো বন্ধুর বাড়ি। ব্যাংকের উচ্চপদস্থ অফিসার, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার উঠাবসা আলাপচারিতা থাকতেই পারে।

— তোমার স্বামী ব্যাংকে চাকরি করে?

— বিয়ের সময় সে নিজেকে ব্যাংকের উচ্চপদস্থ অফিসার হিসাবে তুলে ধরেছিল। অথচ স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। আমি কলেজে ভরতি হয়েছিলাম। হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

— তারপর?

— আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমার মনেও নানারকম স্বপ্ন ছিল। আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ি থাকবে। শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করব। কিন্তু...।

ঝুমার অন্তরাত্মা মন্থন করে একটা দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়ল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবারও বলল, অবিনাশ চৌধুরী লোকটাকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লাগেনি। মদের নেশায় চুর, চোখে-মুখে কামনার আগুন। সামনাসামনি হতে এমন করে আমার দিকে তাকাল, হায়েনা যেমন বধ করার পূর্ব মুহূর্তে শিকারের পানে তাকায়। ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছিলাম। সোমনাথকে বললাম, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।

— সোমনাথ?

— সেইতো আমার পতিদেবতা।

ততক্ষণে গাড়ি মোরগ্রাম রেলওয়ে ওভারব্রিজ ক্রস করে এসেছে। সামনেই ফিলিং স্টেশন। ঝুমা গতি কমাতে কমাতে এসে একটা পান-বিড়ির গুমটির কাছে গাড়ি দাঁড় করাল। মানি পার্স খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বিশালের হাতে দিয়ে বলল, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো।

— তুমি স্মোক করো?

— শুধু স্মোক? লাইনে এসেছ, ধীরে ধীরে টের পাবে ঝুমা কী চিজ।

কথা না বাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে গুমটি লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল বিশাল। তখন ঝুমা পিছু ডেকে বলল, এক বোতল ঠান্ডা জল নিয়ো।

গুমটিওয়ালা জল রাখে না। পাশের হোটেল থেকে সংগ্রহ করতে হল। ফিরে এসে বোতল আর সিগারেটের প্যাকেট ঝুমার হাতে দিলে সে সিল কেটে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বোতলটা পাশের সিটে রেখে দিল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে বিশালের দিকে বাড়িয়ে ধরল, নাও ধরাও।

— নো থ্যাংকস। আমি স্মোক করি না। পিছনের সিটে উঠে বসল বিশাল।

ঝুমা সিগারেটে আগুন দিল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি গন্ধে গাড়ির ভেতরটা ম ম করে উঠল। অতঃপর কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ সাদা ধোঁয়া নির্গত করে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল।

— তারপর বলো সোমনাথ কী করল?

সামনে একটা সরকারি বাস দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। বাসটাকে ওভারটেক করার জন্য ঝুমা গাড়ির গতি বাড়াল। মাঝামাঝি পৌঁছে খেয়াল করল বিপরীত দিক থেকে একটা লরি ছুটে আসছে। অগত্যা পিছিয়ে আসতে হল তাকে।

— তখন কী জানতাম আমি একটা নপুংসকের গলায় মালা পরিয়েছি। বিয়ের নামে প্রহসন করা হয়েছে আমার সঙ্গে। সরকারি বাসের পিছনে নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে বলছিল ঝুমা। বলতেই থাকল, একটু আসছি বলে সে আমাকে ক্ষুধার্ত হায়েনার মুখে ফেলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু কী তাই, বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দিয়েছিল সে।

— ওহ গড! সোমনাথ সান অফ আ বিচ। ওকে জীবন্ত জ্বালিয়ে মারতে ইচ্ছা করছে।

— ওকে তুমি গালমন্দ করতে পারো না। মনে রেখো সোমনাথ আমার স্বামী।

— এখনও তুমি তাকে স্বামী বলে মানো?

— শাস্ত্রের বিধান। অগ্নি সাক্ষী রেখে, সাত পাকে বেঁধে ঘরে তুলেছে যখন...

কথায় কথায় কখন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে বিশাল খেয়াল করেনি। গাড়িঘাট সেবা নার্সিংহোমের কাছাকাছি রাস্তার একদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঝুমা বিশালকে উদ্দেশ করে বলল, গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঘাটে চলে যাও। তারপর যেমন বলা হয়েছে তেমন করবে। সব কথা মনে আছে তো?

— আমাদের আবার দেখা হবে কোথায়? গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— মাঝি তোমাকে যেখানে নামাবে সেখান থেকে সোজা পাড়ে উঠে আসবে। আমি ঠিক তোমার কাছে পৌঁছে যাব। আজ তোমার প্রথম দিন, সুষ্ঠভাবে কাজ শেষ

করে ফিরে এসো। বেস্ট অফ লাক।

বিশাল কোনো কথা বলল না। ডানহাতের ঊর্ধ্বমুখী বুড়ো আঙুল প্রদর্শন করে পূর্বমুখী হাঁটা শুরু করল। ঝুমা দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুটা এসে বাঁয়ে টার্ন নিয়ে সুজাপুরের রাস্তা ধরে চলতে লাগল। রাস্তার দু-ধারে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাড়িঘর। মাঝে মাঝে আম-লিচু-কাঁঠালের বাগান। পাড়ার মেয়ে-বউরা কুলো ভরতি পাতা-তামাক নিয়ে গোল হয়ে বসে বিড়ি বাঁধছে। কেউ বা কাঁঠাল পাতা ভেঙে ছাগলকে খাওয়াচ্ছে। ক-জন ছেলে বাগানের একপ্রান্তে ব্যাট-বল নিয়ে ক্রিকেট প্রাকটিস করছে।

সিঙ্গল রাস্তা। ছোটো-বড়ো নানারকম যানবাহনের ছুটোছুটি লেগেই আছে। এরই মাঝে রাস্তা পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলি অবলোকন করতে করতে ধীরে ধীরে এগোতে থাকল সে। হঠাৎ লুকিং গ্লাসে চোখ পড়তে তার পিলে চমকে উঠল। পুলিশের স্টিকার লাগানো একটা জিপ দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে পিছনে।

রঘুনাথগঞ্জ গাড়িঘাট। একসময় ভাগীরথী নদীর এই ঘাটটি মূলত গাড়ি পারাপারের কাজে ব্যবহার করা হত। মানুষ পারাপারের জন্য ছিল সদরঘাট। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড থেকে সদরঘাটের দূরত্ব অনেক। শহরের ঘনবস্তি এলাকার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ঘুরে যেতে গিয়ে বারবার যানজটের সম্মুখীন হতে হয়। সময়ের অপব্যয় ঘটে। এদিকে বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়িঘাটের দূরত্ব কম, সোজা রাস্তা। যানজটের কোনো বালাই নেই। এইসব কারণে এক-দুইজন করে পারাপার শুরু করলে পৌর-প্রশাসনের টনক নড়ে। একদিকে জেটি, আর-একদিকে পুণ্যস্নানে আসা মানুষের ব্যবহারোপযোগী স্নানঘাট নির্মাণ করে দিয়েছে। জেটির আবার দুটি অংশ। এক অংশ মানুষ, অপর অংশ গাড়ি পারাপারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘাটে চলে এল বিশাল। স্নানঘাটে নানা বয়সি মানুষের ভিড়, অধিকাংশই মহিলা। পুণ্যলাভের আশায় ডুব দিয়ে সূর্য প্রণাম করছে। আছে বেশ কিছু সদ্যজাত শিশু, মা ও শিশু গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হতে এসেছে। নদীবক্ষে ভাসমান নৌকোর সংখ্যাও কম নয়। বেশিরভাগ জেলে-নৌকা। কেউ জাল ফেলে মাছ ধরছে। কেউ বা বঁড়শি ফেলে মাছের সন্ধানে ঘুরছে।

বিশাল কাঙ্ক্ষিত নৌকার খোঁজে ডান-বামে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখতে থাকল। পরনে বড়ো চেকের লুঙ্গি, সবুজ সার্ট, গলায় খুদি চেকের গামছা জড়িয়ে পান চিবোতে চিবোতে নৌকা বাইতে দেখা যায় না কোনো মাঝিকে। সে কি তবে এখনও এসে পৌঁছোয়নি? বিশাল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছেছে ঘাটে, কাজেই তার এসে ফিরে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তাহলে...?

চাপা উত্তেজনায় ভিতর ভিতর টগবগ করে ফুটতে থাকে বিশাল। যত সময় যায় ততই উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। পাঁচ...দশ...পনেরো...বিশ..., মিনিটের কাঁটা পৌ

পোঁ করে ঘুরে চলেছে। কমবেশি আধঘন্টা অপেক্ষা করে সে ফিরে যাওয়া উচিত বিবেচনা করে শেষবারের মতো নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

ঘাট ছাড়িয়ে কিছুটা দক্ষিণে শ্মশান, প্রচলিত ডাকে মরঘাটি। ওদিক থেকে একখানা নৌকা ভেসে আসতে দেখা যাচ্ছে। নৌকাতে মাঝিই একমাত্র সওয়ারি, স্রোতের প্রতিকূলে খুব ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে। বিশালের মনে আশার সঞ্চার হল, ওই নৌকাখানা হলেও হতে পারে। যদিও দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না মাঝি কী পোশাক পরে আছে। তবু থেকে গেল, কাজের প্রথমদিন বিফল হয়ে ফিরে যেতে মন করে না।

ইতোমধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল। হঠাৎ করে বিশাল খেয়াল করল দুই যুবক তার প্রায় পিঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পোশাকে জঙ্গীপুর পৌরসভার ব্যাচ লাগানো। মুহূর্তের জন্য বিশালের মনে ভীতির সঞ্চার হল। পরক্ষণে সামলে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে তাদের জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছেন?

— অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি আপনি জেটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এর মধ্যে অনেকগুলো নৌকা ওপারে গেছে, তার একটাতেও আপনি উঠলেন না। কী ব্যাপার? ওদের একজন বলল।

ঘাবড়ায় না বিশাল। মুচকি হেসে বলল, ঠিক ধরেছেন। আমি অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছি। আসলে একটা নৌকা রিজার্ভ করা আছে। আমি তার অপেক্ষা করছি। আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না।

— কোথায় যাবেন? দ্বিতীয় জন জানতে চাইল।

— নির্দিষ্ট কোথাও না। নদীপথে একটু ঘুরব।

— কোত্থেকে আসছেন? দ্বিতীয় জন পুনরায় জিজ্ঞাসা করল।

—আমার বাড়ি বীরভূমে। মাসির বাড়ি বেড়াতে এসেছি। আমাদের ওদিকে তেমন কোনো বড়ো নদী নেই। হঠাৎ করে বাসনা হল নদীপথে একটু ভ্রমণ করি। তাই আর কি...

— যে নৌকাটি ভাড়া করেছেন তার অনুমোদন আছে তো? প্রথম যুবক জানতে চাইল।

— তাতো বলতে পারব না। মাসতুতো দাদা ভাড়া করেছেন।

— আজকাল এই পথে দু-নম্বরি মাল পাচার হচ্ছে খুব। পৌরসভার অনুমোদনহীন কোনো নৌকায় বিহার করা আপনার জন্য নিরাপদ নাও হতে পারে। সেই যুবক পুনরায় বলল।

— আপনার কথা মনে থাকবে। ধন্যবাদ।

হাত বাড়িয়ে দিল বিশাল। ওরা এক এক করে করমর্দন করে জেটি ছেড়ে চলে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে।

ততক্ষণে নৌকাখানি জেটিতে ভিড়েছে। মাঝির পরনের পোশাক বলে দিচ্ছে এই সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। দেরি করা ঠিক হবে না। ঝুমা হয়তো টেনশন করতে শুরু করেছে। নৌকায় পা দেবার আগে আড় চোখে উপর দিকে তাকাল বিশাল, ছেলেদুটো এদিকেই তাকিয়ে আছে। কঠিন পরিস্থিতি। নৌকায় না উঠলে মাঝি পালিয়ে যেতে পারে, পক্ষান্তরে নৌকায় উঠলে ওরা ধাওয়া করবে! কী করা যায়? ইতিকর্তব্য স্থির করতে গিয়ে বিশাল একটু বেশি ঝুঁকি নিল। ছেলেদুটোকে উদ্দেশ্য করে হাত নেড়ে বলল, আসি বন্ধু।

ওরা হেসে থামস আপ করল। বিপদ কেটে গেছে। দেরি না করে সে নৌকায় পা রাখল। অমনি মাঝি রে রে করে তেড়ে এল, নাম নাম। নৌকা রিজার্ভ আছে।

— সবই তার ইচ্ছা। কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করল বিশাল।

মাঝি আর উচ্চবাচ্য করল না। স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে দিল।

মাঝি হাল ধরে বসে আছে। বিশাল এমন অ্যাক্টিং করতে থাকল যেন সে সত্যিই নৌকাবিহার করতে এসেছে। কখনও উবু হয়ে দু-হাতে জল নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে, কখনও বসে পা ভেজাচ্ছে।

ভাসতে ভাসতে নির্জন এলাকায় এসে মাঝি বলল, হালে হাত দাও। টাকার ব্যাগটা বার করি।

তখন ওরা মাঝ নদীতে। নদীর উভয় পাড়ে আম-লিচুর বিস্তীর্ণ বাগান। আশেপাশে কোনো নৌকা নেই। বিশাল মাঝির পিছন দিকে গিয়ে হাল চেপে ধরল। দাদু রহমান ছিল জাত মাঝি। তার সঙ্গে নদীবক্ষে পাড়ি জমানোর সৌভাগ্য তার হয়নি। কিন্তু পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বারবার ভাগীরথীর বুকে ভেসেছে। নিছক প্রমোদভ্রমণ। স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে নেমে গেছে নীচে, অনেক নীচে। ফেরার পথে পালা করে দাঁড় টেনেছে, হাল ধরেছে। তার অসুবিধা নেই।

মাঝি নৌকোর পাটাতনের গোপন স্থান থেকে একটি সাধারণ চটের ব্যাগ বার করে এনে বিশালের পায়ের কাছে রেখে বলল, মাল দাও।

ঝুমার নির্দেশ মতো কথা না বাড়িয়ে বিশাল মালের প্যাকেট বার করে মাঝির পায়ের কাছে রেখে দিল। ততক্ষণে নৌকা সুজাপুর ছাড়িয়ে চড়কা-দফরপুর এলাকায় প্রবেশ করেছে। এই এলাকা তেমন ঘনবসতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া নদীপাড়ের উচ্চতা অনেক বেশি এবং খাড়া। মাঝে মাঝে পাড় কেটে ধাপে ধাপে ঢালু করে ঘাট বাঁধা হয়েছে। এরকমই এক ঘাটে লোকজন না থাকায় মাঝি বিশালকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এলাকাটা তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঘাটে নেমে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল কেউ ফলো করছে কি না? তারপর একটা একটা করে ধাপ অতিক্রম করে উপরে উঠতে লাগল।

পিছনে পুলিশের স্টিকার লাগানো গাড়ি দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল ঝুমা। কোনোভাবে তাদের গোপন অভিযানের কথা প্রকাশ হয়ে যায়নি তো? এই লাইনের সবচেয়ে ভয়ানক দিক হল নিজের লোকের বিশ্বাসঘাতকতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে দলের লোক টাকা-পয়সা অথবা অন্য কোনো প্রলোভনে পড়ে পুলিশকে ইনফর্ম করে। ধরা পড়লে জেলের ঘানি টানা অথবা এনকাউন্টারে নিহত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

ঝুমা গাড়ির গতি বাড়াল না, যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশের জিপ তাকে ওভারটেক করে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরজেন্ট ব্রেক চেপে না ধরলে পুলিশের গাড়িতে ঝুমার গাড়ি ঠুকে যেত। অন্য সময় হলে তার মুখ দিয়ে অকথ্য গালিগালাজ বেরিয়ে আসত। নেহাত পরিস্থিতি নাজুক তাই চুপ থেকে গেল।

পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে কয়েকজন সিপাই দ্রুত এগিয়ে এলেন। অফিসার একটু ঝুঁকে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ম্যাডাম আপনি কোথায় যাবেন?

এদিকে কতটা যেতে হবে ঝুমার জানা নেই। যেখানে বিশালকে পাবে তুলে নিয়ে ফিরে আসবে। এ কথা পুলিশকে বলা যায় না। একটু সময় নিয়ে উত্তর দিল, চরকা মাজারে। কেন বলুনতো?

— কোত্থেকে আসছেন?

— বহরমপুর।

— এই গাড়ি আপনার?

— এত প্রশ্ন করছেন কেন?

ঝুমার কথায় আমল না দিয়ে অফিসার বললেন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে?

— থানায়! কেন? শব্দযুগল দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেও ঝুমার বুকের ভিতরে ততক্ষণে হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করেছে। কপালে, ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবে সে নিজেও জানে না।

এই অবস্থায় ঝুমার হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে অফিসার আরও বললেন, গতরাতে বহরমপুরে অশোক নামের এক ড্রাগ পাচারকারী পুলিশি-এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। আমাদের কাছে খবর আছে তার সঙ্গীসাথিরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। আর আপনি...

— আপনার কী মনে হয় আমি ড্রাগ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত? মরিয়া হয়ে উঠে বলল ঝুমা।

— না মানে, আমি তা বলিনি। অফিসারকে আমতা আমতা করতে দেখে ঝুমা স্বমহিমায় ফিরে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল।—তাহলে থানায় ডাকছেন কেন?

ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে যাকে ইচ্ছা হ্যারাস করতে পারেন না। আমি এসপির কাছে কমপ্লেন করব। আপনার ব্যাচ নাম্বার বলুন?

— আপনি চটছেন কেন ম্যাডাম?

— কেন চটব না? কোথাকার কে খুন হয়েছে তার জন্য এখন আমাকে থানায় গিয়ে...। এনি হাউ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি কি আসতে পারি?

অফিসার কী বুঝলেন তিনিই জানেন, জিপের কাছে গিয়ে ড্রাইভারকে রাস্তা ছেড়ে দিতে বললেন।

বিশাল নদীর পাড় থেকে পাকা রাস্তায় উঠে এসে একটি পুরোনো বটগাছের তলায় অপেক্ষা করছিল। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে ঝুমা সেখানে পৌঁছে গেল। গাড়িতে উঠে টাকার ব্যাগ ঝুমার হাতে দিয়ে বলল, তোমার এত দেরি হল কেন?

— পুলিশের খপ্পরে পড়েছিলাম।

— হরিবোল!

— ও কিছু না। কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাব, এইসব জিজ্ঞাসা করছিল। বাই দ্য ওয়ে, তোমার কোনো প্রবলেম হয়নি তো? অশোকের সঙ্গীদের খোঁজ-খবর করার বিষয়টা ইচ্ছা করে চেপে গেল ঝুমা।

— নট এনি মোর।

— গুড! বাংলোয় ফিরে শুভ সংবাদটা বসের কানে পৌঁছে দিয়ে আজকের মতো তোমার ছুটি।

দিন শেষে ঝুমার হাত থেকে পারিশ্রমিকের টাকা হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে পড়ল বিশাল। জীবনে এই প্রথম এতগুলো টাকা একসঙ্গে দেখছে!

টাকার বান্ডিল থেকে তিন হাজার টাকা পৃথক করে বুক পকেটে রেখে, বাকিটা প্যান্টের পকেটে ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল। চরণ তারই অপেক্ষা করছিল। দেখেই ছুটে এল।

— গুরু।

— তোর কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

— না।

— গুড! চল এখানে আজ আর কাজ নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বছর ঘুরতে না ঘুরতে গণেশ উলটে গেল। অবিনাশ চৌধুরীর চেয়ার, বাংলো, ব্যাবসা, সবকিছু এখন বিশালের দখলে। তার এই সাফল্যের পিছনে ঝুমার অবদান যথেষ্ট।

পিছন থেকে সে শক্তি না জোগালে তার একার পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অগ্রসর হওয়া কখনোই সম্ভব হত না।

সেদিন মাল নিয়ে ফারাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল ওরা। চালকের আসনে যথারীতি ঝুমা, পিছনের সিটে বিশাল। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের বুক চিরে হু হু করে ছুটে চলেছে তাদের গাড়ি। মঙ্গলজুন ফিলিং স্টেশন পেরিয়ে লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে চমকে উঠল ঝুমা। একটি জিপ আসছে পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিশালকে অ্যালার্ট করে—পুলিশের জিপ আমাদের ফলো করছে।

— হোয়াট?

— পিছনে দ্যাখো, দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে।

ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনে তাকাল বিশাল। দেড়-দু-কিমি দূরে একটা জিপ চোখে পড়ল তার। তবে সেটা পুলিশের কিনা বোঝা গেল না। তখন সে বাইনোকুলার চোখে ধরল।

— ঝুমা স্পিড বাড়াও।

বর্ষাকাল। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। এখনও রাস্তাঘাট ভিজে। ভেজা রাস্তায় ফুল স্পিডে ড্রাইভ করার ঝুঁকি অনেক। যে কোনো সময় স্লিপ করে অন্য গাড়ির সঙ্গে ঠুকে যেতে পারে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে আছড়ে পড়তে পারে। ঝুমা আশঙ্কা প্রকাশ করলে বিশাল বলল, ডেথ বেটার দ্যান পুলিশ কাস্টডি। অ্যাক্সিডেন্ট হয় হোক, তুমি স্পিড বাড়াও।

মাঠ পেরিয়ে অজগরপাড়া মোড়। মোড় থেকে একটি সিঙ্গল রাস্তা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা কতদূর বিস্তৃত, অন্য কোনো রাস্তার সঙ্গে সংযোগ আছে কিনা জানা নেই। বিশালের মনে হল পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ওই পথে গা ঢাকা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে ঝুমাকে নির্দেশ দিল, সামনের মোড়ে পৌঁছে লেফট টার্ন নেবে।

— পার্টি এসে খালি হাতে ফিরে গেলে বস কিন্তু ভীষণ রেগে যাবেন।

— উনি হুকুম করেই খালাস। ফিল্ডে এলে হ্যাপা বুঝতেন। শালা আমাদের জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে, আর উনি...। লেফট, লেফট।

সামান্য গতি কমিয়ে লেফট টার্ন নিয়ে পুনরায় গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ঝুমা। কিন্তু অধিক সময় তা ধরে রাখা সম্ভব হল না। সিঙ্গল রাস্তা, তার ওপর সেদ্ধ ধান রাস্তায় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকা, বর্ষার প্রকোপে বাড়ির আগনা ভিজে থাকায় সেদ্ধ ধান শুকোনোর কাজ চলছে রাস্তায়। জায়গায় জায়গায় গোবর ঢিবি করে রাখা হয়েছে। বাঁ দিকের চাকা মাটিতে রেখে ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে।

— খানকির বাচ্চারা রাস্তাটাকে বাপের সম্পত্তি মনে করছে। দেব উপর দিয়ে চালিয়ে। রাগে গজগজ করতে করতে বলল ঝুমা।

— খবরদার ওই ভুল কোরো না। গ্রামের মানুষ সহজ সরল বটে, তবে যদি একবার দোষ ধরে পালাবার পথ পাবে না।

— তাই বলে মাঝ রাস্তায় ঘরগেরস্থালি করবে?

— ওদের দোষ নেই। এই রাস্তায় তেমন গাড়ি চলাচল করে না। তাছাড়া বর্ষায় সবকিছু ভিজে লাট হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ধান না শুকোলে খাবে কী লোকে?

— ও গড! এবার কী হবে? ঝুমা আর্তনাদ করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাও জোর ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

— কী হল? থামলে কেন?

— রাস্তা কাটা।

— হোয়াট?

বিশাল চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে পিছনদিকে নজর রাখছিল। ঝুমার কথায় চোখ থেকে বাইনোকুলার সরিয়ে ঘুরে তাকাল। নদীর উভয় পাড়ে সংযোগ স্থাপনকারী সেতুটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশাল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, নো প্রবলেম। আমরা মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে এসে গেছি।

— ওরা যদি এদিকে আসে? নাহ আজ আর রেহাই নেই। ঝুমার কণ্ঠ থেকে আশঙ্কা ঝরে পড়ল।

— সময় আছে। ততক্ষণে নিশ্চয় গুছিয়ে নিতে পারব।

— হাউ? চালকের আসন থেকে নেমে এসে বিশালের পাশে দাঁড়িয়ে বলল ঝুমা।

— তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি। তারপর যে রাস্তা দিয়ে এসেছে সেদিকে দৃষ্টি রেখে চোখে বাইনোকুলার চেপে ধরল। একটু বাদে চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে বলল, তোমার আশঙ্কাই সত্যি। পুলিশের জিপ এদিকেই আসছে।

— বাপরে! আজ গেছি। ভয়ে কুঁকড়ে গেল ঝুমা।

— একদম টেনশন নেবে না। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। ঝুমা টিকটিকির মতো মাথা নাড়ালে বিশাল আবারও বলল, বাইনোকুলার হাতে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বোসো। কলকাতার মেয়ে গ্রামের বন্যা দেখতে এসেছ। একদম স্বাভাবিক আচরণ করবে, তোমার উপর নির্ভর করছে আমাদের সাফল্য। ডোন্ট ওরি, গো অ্যাহেড।

বিশালের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে ঝুমা দু-লাফে নদীর কিনারায় গিয়ে জল ছুঁয়ে বসে পড়ল। মাস চারেক আগে আরটি অফিসারকে টাকা খাইয়ে গাড়ির ফলস রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, নম্বর প্লেট করিয়ে রেখেছে। সেগুলো গাড়ির ব্যাক সিটের তলায় যত্ন করে রাখা আছে। ক্ষিপ্রহাতে আসল নম্বর প্লেট খুলে নদীর জলে ছুড়ে

ফেলে দিয়ে ফলসটা ঝুলিয়ে দিল। তারপর আসল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটা মোজার ভিতর লুকিয়ে নকলটা ড্যাশবোর্ডের উপর রাখল।

গাড়ি নিয়ে আপাতত টেনশন খতম। কিন্তু মালের কী হবে? এতদূর ধাওয়া করে এসে পুলিশ মুখ দেখে ফিরে যাবে না নিশ্চয়। গাড়ি তল্লাশি করবে, বডিও চেক করতে পারে। কী করা যায় এখন?

সঙ্গে দু-প্যাকেট হেরোইন আছে। প্যাকেট দুটো নিয়ে বিশাল ঝুমার কাছে গেল, এগুলো কীভাবে রক্ষা করা যায় বলো দেখি?

— আমাকে দাও, শাড়ির ভাঁজে রেখে দিই। ওরা তোমার বডি সার্চ করলেও আমার গায়ে নিশ্চয়...

ঝুমার মুখের কথা কেড়ে বিশাল বলল, হাত দেবে না? ন্যাংটা করে সার্চ করবে। ড্রাগসের বেলায় ওদের অনেক ছাড় আছে।

— তাহলে?

— জলে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় দেখছি না।

— তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! চল্লিশ লাখ টাকার মাল আছে। নষ্ট হলে বস কাউকে আস্ত রাখবে না।

ঝুমা প্যাকেট ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে বিশাল তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। — এগুলো কাছে রাখার পরিণাম হল মৃত্যুকে আহ্বান করা। আর-একটা কথা মনে রেখো আমরা ধরা পড়লে অবিনাশ চৌধুরীও রেহাই পাবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলল না ঝুমা। একটু সময় নিয়ে বলল, কী জবাব দেবে বসকে?

— যা সত্যি। তুমি বললে উনি মেনে নেবেন।

— না বিশাল। তুমি যা ভাবছ বিষয়টা তত সহজ নয়। অবিনাশ চৌধুরী ঝুমা কেন, এ ব্যাপারে নিজের বাপকেও বিশ্বাস করে না। অশোকের বেলায়...

— কী করতে বলছ তুমি? পুলিশের হাতে ধরা দেবে?

— আমি কিছু ভাবতে পারছি না। তুমি যা ভালো বোঝো করো। বিচলিত হয়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল ঝুমা।

ওদিকে পুলিশের জিপ প্রায় এসে গেছে। ভাবনাচিন্তার অবকাশ খুব একটা নেই। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে বিশাল প্যাকেট দুটো নদীর মাঝ বরাবর ছুড়ে ফেলে দিল। ঢেউয়ের তালে তালে বার কয়েক কোমর দুলিয়ে তা জলের অতল গহিনে নিমজ্জিত হল।

ঝুমা মাটিতে বসে পড়ল। নদীর উত্তাল জলরাশির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিশাল দেরি না করে রাস্তায় উঠে এল।

উলটো দিকে জেলেরা জাল ফেলে মাছ শিকার করছে। ক-টা ছেলে নদীর কিনারায় বড়ো বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে। সম্ভবত ধরা মাছ হাঁড়িতে মজুত করে রাখা হচ্ছে। বিশাল ধীর পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তার ধারণাই সঠিক, হাঁড়িতে হাঁড়িতে নানা জাতের, নানা সাইজের মাছ মজুত করা হয়েছে।

— মাছ বেচবে? একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— আপনি নেবেন?

একটি বড়ো সাইজের চিতল মাছ তুলে ধরে বিশাল জিজ্ঞাসা করল, এটার কত দাম দিতে হবে?

ছেলেটি চিৎকার করে বাবার কাছে মাছের দাম জানতে চাইলে সে তিরিশ টাকায় ছেড়ে দিতে বলল। বিশাল তো আর মাছ কিনতে আসেনি। কথায় কথায় টাইম ওয়েস্ট করা তার উদ্দেশ্য। তাই দরাদরি শুরু করল।

— পনেরো টাকায় হলে দাও।

— না বাবু তিরিশ টাকার কমে হবে না।

— আর দুটাকা ধরিয়ে দিচ্ছি। সতেরো টাকা কিন্তু কম নয়।

ছেলেটার সঙ্গে কথায় মেতে থাকলেও বিশালের নজর রয়েছে রাস্তায়। পুলিশের জিপ এসে তাদের গাড়ির কাছে থামল। কয়েক জন সিপাই দ্রুত জিপ থেকে নেমে তাদের গাড়িটাকে ঘিরে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। সকলেই সশস্ত্র, ভারী আগ্নেয়াস্ত্র তাদের হাতে। বিচলিত হল না বিশাল। মাছটা তার হাতে ধরা। বুক পকেট থেকে বিশ টাকার একখানা নোট বের করে ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, আর না কোরো না।

ছেলেটি পলিপ্যাকে মাছ ভরে হাতে দিলে বিশাল সেটি দোলাতে দোলাতে উপরে উঠে এল। ততক্ষণে অফিসার জিপ থেকে নেমেছেন। উঁকি মেরে দেখছেন ভিতরে কেউ আছে কি না। বিশাল পিছন দিক থেকে সাড়া দিল, ইয়েস! বলুন?

অফিসার পিছন ফিরে কিছু বলবেন এমন সময় ঝুমা চিৎকার করে উঠল, ওগো এদিকে এসো। দ্যাখো কত বড়ো একটা সাপ।

— সাপ! কোথায়?

— এই দ্যাখো একেবারে আমার কাছে চলে এসেছে। কী সাপ গো, ফণা আছে?

— ওহ গড! তুমি একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখছি। তখন থেকে বলছি অনেক হয়েছে, এবার ফিরে চলো। আমার কথা শুনলে তো—

পলিপ্যাক গাড়ির বনেটের উপর রেখে বিশাল ঝুমার কাছে যেতে চাইলে অফিসার বাধা দিলেন, দাঁড়ান।

— প্লিজ অফিসার। দুজন কনস্টেবলের ফাঁক গলে দ্রুত নীচে নেমে গেল বিশাল।

সত্যি সত্যি একটা সাপ বানের জলে ভাসতে ভাসতে ঝুমার কাছাকাছি চলে এসেছে। বিষাক্ত কালকেউটে, দেড় মিটার মতো লম্বা।

— জানো এটা কী সাপ? সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত, কালকেউটে এর নাম। এক ছোবলে তোমার গ্রামের বন্যা দেখার সাধ মিটিয়ে দেবে। ওঠো। ঝুমাকে প্রায় জোর করে টেনে তুলল বিশাল।

বিশাল ইচ্ছা করেই জোরে জোরে কথা বলছিল যাতে পুলিশের লোকেরা শুনতে পায়। ঝুমাও তেমনি অভিমানে নাক ফুলিয়ে বলল, তুমি না ভীষণ নিষ্ঠুর!

— ঢের হয়েছে, আর দেখতে হবে না। ঝুমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে এল বিশাল। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, আর বলবেন না স্যার সকাল থেকে জ্বালিয়ে মারল। এনিওয়ে, কী যেন বলছিলেন আপনি?

পুলিশ অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশালের আপদমস্তক জরিপ করে নিলেন। তারপর ঝুমার দিকে ইশারা করে বললেন, ইনি?

— আমার ওয়াইফ।

— হুম্! এই গাড়িটা আপনার?

— না। ওটা আমার স্ত্রীর। কেন বলুন তো?

— আমরা আপনাদের গাড়ি সার্চ করব।

— কোন গ্রাউন্ডে? গর্জে উঠল বিশাল।

— আমরা চোর-ডাকাত না পাচারকারী? দৃঢ় কণ্ঠে বলল ঝুমা।

— সরি! আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে এই গাড়িতে করে ড্রাগস পাচার করা হচ্ছে। প্লিজ হেল্প উইথ আস। দরজা খুলুন।

— আপনি জোর করলে আমি দেখাব। কিন্তু আপনি তা করতে পারেন না। তল্লাসির নামে কোনো ভদ্র ফ্যামিলির লোককে হ্যারাস করার অধিকার আপনার নেই। জানেন আমার ওয়াইফ একজন অধ্যাপক।

— ছাড়ো বিশাল। দেখতে দাও ওঁকে। দরজা আনলক করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল ঝুমা।

অফিসারের নির্দেশে একজন গাড়িতে উঠল। বাকিরা পার্শ্ববর্তী ঝোপঝাড় হাতড়াতে শুরু করল।

— আপনার স্ত্রী অধ্যাপক? অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

— হ্যাঁ। কলকাতার একটি বেসরকারি কলেজে পড়ায়।

— আপনি কী করেন?

— বিজনেস। কলকাতায় আমার লোহার ব্যাবসা আছে।

— হুম্! এদিকে কী উদ্দেশ্যে? আই মিন, কলকাতার মানুষ এই বর্ষা-বাদলের দিনে...

— আদতে আমি গ্রামের ছেলে। ওর বাপের বাড়ি হাওড়ায়। অনেক দিন বাদে গ্রামের বাড়িতে এসেছি। ও বলল এলাকাটা ঘুরে দেখবে। তাই...

একে একে সব কনস্টেবল ফিরে এল। গাড়িতে কিংবা আশেপাশে কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। অফিসার বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন, ইমপসিবল! মাল পেতেই হবে। পাকা ইনফরমেশন আছে এই গাড়ি করেই হেরোইন যাচ্ছে ফারাক্কায়। এক কাজ করো...। থামলেন অফিসার। কিছু ভেবে নিয়ে ঝুমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওঁর বডি সার্চ করো।

অফিসারের নির্দেশ পেয়ে দু-জন কনস্টেবল ঝুমার দিকে অগ্রসর হলে বিশাল রুখে দাঁড়াল, খবরদার কেউ আমার স্ত্রীর গায়ে হাত দেবেন না। অফিসার হচ্ছেটা কী? কোনো মহিলার দেহ তল্লাশি করতে হলে মহিলা-পুলিশ দিয়ে করাতে হয় আপনার জানা নেই? আপনার অত সন্দেহ যখন তখন কোর্টে চলুন। জাজের সামনে যা হবার হবে। ঝুমা তুমি গাড়িতে ওঠো। দেখি কে তোমার গায়ে হাত দেয়।

বিশাল দরজা খুলে ধরলে ঝুমা গাড়িতে উঠে বসল। অফিসার বললেন, আমাকে আইন শেখাবেন না মিস্টার।

এমন সময় একজন কনস্টেবল বলল, বড়ো ভুল হয়ে গেছে স্যার। আমরা যে গাড়ির পিছু ধাওয়া করে এসেছি এটা সেই গাড়ি নয়।

— বলছ কী হে! এবার অফিসারের অবাক হবার পালা। নম্বর প্লেটে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, এদিকটা আমাদের আগে দেখা উচিত ছিল। সরি মিস্টার, আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্য দুঃখিত।

বিশাল কোনো কথা বলল না। অফিসার জওয়ানদের উদ্দেশে বললেন, গাড়িটাকে এদিকেই আসতে দেখলাম।

— আমার মনে হয় ওরা গ্রামের ভিতরে ঢুকে আড়াল নিয়েছে। আমরা বুঝতে পারিনি। অপর একজন কনস্টেবল বলল,

— ঠিক তাই। ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাও। অফিসার আর-এক প্রস্থ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দলবলসহ গাড়িতে উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের জিপ দৌড়োতে শুরু করল অজগরপাড়া মোড়ের উদ্দেশ্যে।

টেনশনের চোটে ঝুমার তখন মরোমরো অবস্থা। স্টিয়ারিং-এ কপাল ঠুকে চুপচাপ বসে আছে সে। বিশাল গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা নেই। প্রবল ভূমিকম্পে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবার পর যেমন চারদিকে নিরঙ্কুশ নীরবতা বিরাজ করে, অনেকটা সেই রকম পরিস্থিতি।

হঠাৎ করে একটা ঈগল পাখি ধেয়ে এসে বনেটের উপর থেকে পলিপ্যাকে বন্দি মাছটা তুলে নিয়ে যেতে উভয়ে চেতনা ফিরে পেল।

— থ্যাংক গড। আর-একটু দেরি হলে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়তাম। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঝুমা।

বিশাল কোনো কথা না বলে দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসল। ঝুমা পুনরায় বলল, অফিসার তোমার ওয়াইফের গাড়ির পেপারস দেখতে চাইলে কী দেখাতে?

ড্যাসবোর্ডের উপর নকল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটা দিব্যি শুয়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে ঝুমার হাতে দিয়ে বিশাল বলল, কলেজের অধ্যাপক বলে কথা। কাঁচা কাজ সে করতেই পারে না।

কাগজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঝুমা বলল, য়ু আর আ জিনিয়াস বিশাল। ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড করে রেখেছ কিছু জানাওনি তো।

— সব কথা মেয়েদের বলতে নেই।

— তাই বুঝি! কেন গো? ঝুমা তার বামবাহু বিশালের ডানবাহুতে ঠুকে দিয়ে বলল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কারণ মেয়েদের পেট পাতলা। কোনো কথা বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না।

পরক্ষণে ঝুমার গলা ছেড়ে দিয়ে বলল, কেমন অভিনয় করলাম বলো। অফিসার একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে ফিরে গেলেন। খুব এসেছিলেন বিশালকে বামালসমেত ধরতে।

হঠাৎ করে একটা কথা মাথায় আসতে চুপ করে গেল বিশাল। এমনটা হবার কথা নয়! নিশ্চয় পিছন থেকে কেউ ছুরি মারার চেষ্টা করছে? কে সে? কে, কে? ভাবনাটা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে মাথায় চেপে বসল।

— কী ভাবছ বিশাল?

— আজ আমরা ফারাক্কা যাচ্ছি একথা তুমি-আমি আর সোমনাথ ব্যতীত কারও জানার কথা নয়। ঠিক কিনা?

— রাইট!

— তাহলে পুলিশে খবর দিল কে?

— সোমনাথ?

— তোমার কী মনে হয়?

— অসম্ভব কিছু নয়। তোমার আমার মেলামেশা, আই মিন আমরা দুজনে ব্যাবসা দেখাশোনা করছি, প্রয়োজনে একসঙ্গে বাইরে যাচ্ছি, এসব ওর পছন্দ হচ্ছে না। ক-দিন আগে ও আমাকে একটা কথা বলেছিল, যদিও সেদিন এতটা গভীরে গিয়ে ভাবিনি।

— কী বলেছিল?

— হাত ছোটো করো।

— মানে!

— হয়তো সে ভাবছে আমি তোমাকে...

পুলিশের জিপ চলে যাবার অনেক পরে ওরা পথ চলা শুরু করল। বহরমপুরে বাংলোয় পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে ঘনিয়ে এল। সোমনাথ টিভি দেখছিল। ডাক পেয়ে ছুটে এল। ঝুমা তাকে চেপে ধরল, সারাদিন কোথায় ছিলে?

— এখানেই। কেন?

— কোথায় কোথায় ফোন করেছিলে?

— আমি কাউকে ফোন করিনি। বেলার দিকে বস কল করে জানতে চাইছিলেন তোমরা ফিরেছ কিনা।

— ঠিক আছে যাও। সোমনাথকে বিদায় করে নিজের চেম্বারে ঢুকল ঝুমা। সঙ্গে বিশাল। সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ঝুমা বলল, এখন দ্যাখো বসকে কীভাবে সামলাবে। আমার তো মনে হচ্ছে উনি কিছুই শুনবেন না। চল্লিশ লাখ, এত টাকা জলে গেলে কে আর সহ্য করতে পারে?

ঝুমার কথাই ঠিক। সব শুনে অবিনাশ চৌধুরী সিংহের মতো গর্জে উঠলেন, স্টপ ননসেন্স! পুলিশ-টুলিশ বাজে কথা। মাল তুমি সরিয়েছ।

— আমার কথা বিশ্বাস না হলে ঝুমাকে জিজ্ঞাসা করুন। কোন পরিস্থিতিতে ওই কাজ করতে হয়েছে।

— ও মাগিটা তোমার দলে ভিড়েছে। আমি তোমাদের...

— ভুল বুঝছেন স্যার। এ ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।

— আই ডু নট লাইক টু হিয়ার এনিথিং। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাল ফেরত না দিলে আমি তোমাদের খুন করে ফেলব। অশোকের পরিণতি কী হয়েছে আশা করি ভুলে যাওনি।

— অবিচার করছেন স্যার।

— সাট আপ য়ু চিট। তোমার আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। তোমার হাতে সময় ওনলি টোয়েন্টি ফোর আওয়ারস। জাস্ট মাইন্ড ইট।

খট করে লাইনটা কেটে গেল। অর্থাৎ অবিনাশ চৌধুরী রিসিভার রেখে দিলেন। বিশালও রেখে দিল।

— কী আমার কথা মিলে গেলতো? আমি তোমাকে আগেই বলেছি অবিনাশ চৌধুরী কাউকে বিশ্বাস করে না। লোকসান মেনে নিতে পারে না।

— কোনো মানে হয় এসবের? চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছেন, এর মধ্যে...

— তুমি তো গেছ। আমাকেও পথে বসিয়ে ছাড়লে। চলো এখন দুজনে হাত ধরাধরি করে পালাই।

— ইমপসিবল। যত ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন আমি কোথাও যাচ্ছি না। অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমার আছে।

— তাহলে আজ, এখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করো। আমি আছি তোমার সঙ্গে। ঝুমা সোফা ছেড়ে উঠে এসে বিশালের একটা হাত চেপে ধরল।

— কিন্তু...

— কোনো কিন্তু নয় বিশাল। ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে বাঁচার চাইতে সিংহের মতো লড়াই করে মরা ভালো। শয়তানকে আজই জানিয়ে দাও আমরা আর তার সঙ্গে নেই।

— সোমনাথ! ও কি অবিনাশ চৌধুরীর বিপক্ষে যাবে?

— না গেলে মরতে হবে ওকে।

সেই সন্ধ্যায় আরও একটা কল বহরমপুর থেকে অবিনাশবাবুর কাছে গিয়েছিল। বিশাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে বহরমপুরের ইউনিটের সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক রইল না। এরপরও যদি তুমি নাক গলানোর চেষ্টা করো প্রাণে মারা পড়বে। অবিনাশ চৌধুরী তুমি ঘুমন্ত সিংহকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুলেছ। জাস্ট মাইন্ড ইট।

অবিনাশ চৌধুরীকে জবাব দেবার আগে সোমনাথকে নিয়ে বসেছিল বিশাল। চরণ, ঝুমাও উপস্থিত ছিল সেখানে। এক কথায় বিশালের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সে। তথাপি তাকে নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান বিশাল। তার মন বলছে সোমনাথ পরেও অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সে সময় তাৎক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম বলতে একমাত্র টেলিফোন। বিশালরা বাইরে গেলে সোমনাথ একা বাংলোয় থাকে। টেলিফোনে অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, পুলিশে ইনফর্ম করেও ফাঁসাতে পারে, ইত্যাদি নানাদিক চিন্তাভাবনা করে বিশাল গোপনে টেলিফোনে ভয়েস রেকর্ডার লাগিয়ে রেখেছে। দিন শেষে ভয়েস রেকর্ডার চালিয়ে শোনে সারাদিনে কে কার সঙ্গে কী কথা বলেছে। এক সন্ধ্যায় ভয়েস রেকর্ডার চালিয়ে চমকে উঠল।

— স্যার বিশাল আজ মাল নিয়ে লালগোলা গেছে।

— থানায় খবর দাও।

— কোনো লাভ হবে না। গোলদারবাবু এখন বিশালের পকেটের লোক।

— এত তাড়াতাড়ি সে কী করে গোলদারকে হাত করল?

— ঝুমা থাকতে অসুবিধা কোথায়? সেই তো এখন বিশালকে গাইড করছে। আমাকে একদম পাত্তা দেয় না। বিশালের সঙ্গে থাকে, এক বিছানায় শোয়।

— তোমার ঘেন্না করে না? ছোটোলোক, বস্তির ময়লা তোমার বউকে নিয়ে ফূর্তি করছে। মুখ বুজে থাকবে তুমি?

— কী করব স্যার!

— সে তোমার বউ কেড়ে নিয়েছে। একজন পুরুষের কাছে এর থেকে লজ্জার কী আছে? প্রতিশোধ নাও।

ক্ষণেকের নীরবতা শেষে আবারও অবিনাশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বিশাল রাতে কোথায় থাকে?

— বাংলোয়। মাঝে মাঝে বাড়ি যায়।

— এবার যেদিন বাংলোয় থাকবে, সেটাই তার জীবনের শেষ রাত হওয়া চাই।

— স্যার!

— মেরে ফ্যালো ওকে। আমি তোমাকে ওখানকার বাদশা করে দেব।

— বলছেন স্যার!

— ওখানকার কিছু চাই না আমার। তুমি শুধু বিশালের মৃত্যুসংবাদটা আমাকে দিয়ো। কী পারবে তো?

— হয়ে যাবে স্যার।

— মে গড ব্লেস য়ু! অবিনাশ চৌধুরীর আশীর্বাদ বচন উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়েস রেকর্ডার চুপ করে গেল, অর্থাৎ কোনো একপক্ষ রিসিভার নামিয়ে রাখল।

বিশাল কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সোফায়। খানিক বাদে হেলান দিয়ে মাথাটাকে পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে, চোখ বন্ধ করে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল। সোমনাথকে সরিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে। এ নিয়ে ঝুমার সঙ্গে আলোচনা করা ঠিক হবে কি না, তাও ভেবে দেখল। ভেবেচিন্তে উত্তর পেল, সেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নেই কে বলতে পারে? আপাতত তাকে কিছু জানানোর দরকার নেই। কাজ হয়ে গেলে বলবে। কী রি-অ্যাকশন হয় দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে সেও ষড়যন্ত্রে জড়িত কিনা?

অবিনাশ চৌধুরী খুশি হয়ে ঝুমাকে চুয়াপুর এলাকায় তিন কাঠা মতো জায়গা কিনে দিয়েছিলেন। হয়তো বাড়িও করে দিতেন। কিন্তু পাশের জমিতে পেরেক তৈরির কারখানা গড়ে ওঠায় ঝুমা রাজি হয়নি। দিনরাত বিকট শব্দ সহ্য করতে পারবে না। আসলে তার ইচ্ছা ছিল শহরের পশ এলাকায় একটি ফ্লাট নেওয়ার।

জায়গাটা ওভাবেই পড়েছিল। ক-দিন আগে এক দালাল এসে জানায় পেরেক কারখানার মালিক জায়গাটা কিনতে ইচ্ছুক, ভালো দাম দেবেন। চরণকে সঙ্গে নিয়ে ঝুমা গেছে কথা বলতে। ওরা ফিরল তখন রাত নটা বেজে গেছে।

— কথা হল?

— হ্যাঁ। তিন কাঠার জন্য দশ লাখ টাকা দাম দিতে চাইলেন।

— তুমি কী বললে?

— কথা দিয়েছি। যেদিন টাকা দেবেন রেজিস্ট্রি করে দেব।

কথার ফাঁকে ঝুমা বাজার থেকে কিনে আনা জিনিসপত্র ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখছে। অধিকাংশই মেয়েলি প্রসাধনসামগ্রী। সবশেষে বার করল একটা ভিডিও ডিস্ক। সেটা দেখিয়ে বলল, আজ তুমি ঘরে ফিরতে পারবে না। আমি যেতে দেব না।

অবিনাশ-সোমনাথের কথোপকথন শুনে এমনিতে মাথা ধরে আছে, তার ওপর ঝুমার এই প্রস্তাব। বিশালের মাথার ভিতর বজ্জাত পোকাগুলো কিলবিল করে নড়ে উঠল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, তাই! কেন বলোতো?

— আজ একটা মুভি দেখব। স্রেফ তুমি আর আমি।

— ওয়াও! কী ছবি? বাংলা না হিন্দি?

— হট ব্লু। সুইডিশ।

— ওসব আমার ভালো লাগে না দশ মিনিটের বেশি ধৈর্য রাখতে পারি না। মাথা ঝিমঝিম করে। গা গুলায়।

— তুমিও আজ আমার খাতিরে দেখবে। না বললে শুনব না। বিশালকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল লাগিয়ে বলল ঝুমা।

— তুমি যখন বলছ নিশ্চয় দেখব। বিশাল আলতো করে ঝুমার কপালে চুম্বন এঁকে দিল। খুশি হয়ে ঝুমাও একটা চুমু খেল।

এমন সময় সোমনাথ এল। খাবার আনতে হোটেলে গেছিল সে। খাবারের প্যাকেটগুলো টেবিলে রেখে চলে যাচ্ছিল। বিশাল পিছু ডেকে বলল, তুমি খাবে না?

— আমি খেয়ে এসেছি।

— কী খেয়েছ?

— মাছ ভাত।

—এখন একটু বিরিয়ানি খাও। এসো।

বেসিন থেকে হাত ধুয়ে এসে টেবিলে বসল সোমনাথ। ঝুমা প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিয়ে একটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল। সোমনাথও একটা প্লেট টেনে নিল।

বিশাল তখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে। লক্ষ করে ঝুমা বলল, তোমার আবার কী হল? খাও।

— হ্যাঁ খাচ্ছি।

খাওয়া শেষ করে সোমনাথ চলে গেল। ঝুমা উঠে গিয়ে মদের বোতল, গ্লাস এনে টেবিলের উপর রাখল। তারপর প্লেয়ারে ডিস্‌ক ভরে সুইচ অন করে দিয়ে বিশালের কোল ঘেঁষে বসল। এ লাইনে আসার পর কিছুদিন বিশাল মদ-সিগারেট ছোঁয়নি। কিন্তু পরিবেশ, পরিস্থিতির ফেরে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে কখনোই এতটা পান করে না যাতে করে বেসামাল হয়।

ঝুমা আজ সব ব্যাপারেই অগ্রণী। বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে মদ ঢালল। বিশালকে দিল, নিজেও খেলো। তারপর...

ঝুমা উঠে বাথরুমে গেল। এই অবসরে বিশাল ড্রয়ার থেকে রিভলবার বার করে গদির এক কোণে রাখল, যেদিকে ও শোয়। তারপর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে শুরু করল।

কমবেশি আধঘন্টা বাথরুমে কাটিয়ে ফিরে সরাসরি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ঝুমা। ডানহাত ভাঁজ করে কপালে রেখে চোখ বুজল।

বিশাল খাট থেকে নেমে চুপটি করে ঝুমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। অযথা সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে এসে দরজার ছিটকিনি খুলে পাল্লা আলগা করে দিল। সোমনাথ আসতে চাইলে বাধা না পায় যেন।

রাতটা জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল বিশাল। যাতে সোমনাথ আক্রমণ করার আগেই সে পালটা মার দিতে পারে। ঝুমার মনে খারাপ অভিসন্ধি থাকলে সেও যেন সফল হতে না পারে। শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ঝুমার বুকে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাঝরাতের দিকে দরজার পাল্লা খোলার কিচকিচ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চকিতে বালিশের তলা থেকে রিভলবার বার করে পরপর দুটো গুলি চালিয়ে দিল বিশাল। সাইলেন্সর লাগানো থাকায় বিস্ফোরণের শব্দ হল না। কিন্তু আহতের আর্তনাদ চেপে রাখা যায় না। সোমনাথের মারণ আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল ঝুমার। ধড়মড় করে উঠে বিশালকে চেপে ধরল সে।

— কীসের শব্দ হল?

— একটা লোক আর্তনাদ করে প্রাণ হারিয়েছে।

— ও গড, কে?

মাথার কাছে বেড সুইচ। অন করতে আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারিদিক। মেঝেয় চিত হয়ে পড়ে আছে সোমনাথের প্রাণহীন দেহ। গুলি কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। একটু তফাতে পড়ে আছে সিক্স ক্যালিবারের একটি পিস্তল।

— ও আমাকে খুন করতে এসেছিল।

ঘটনার অভিঘাতে ঝুমা বিহ্বল। চট করে তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। একটু সময় নিয়ে ধাতস্থ হয়ে বলল, ভালোই হল। দুনিয়া খানিকটা পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হল।

বিশাল এবার সরাসরি ঝুমার দিকে তাকাল। ভয়ানক সে দৃষ্টি! বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র পশুরা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেমন করে তাকায়, অনেকটা সে রকম চাউনি।

— আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

বিশাল কোনো কথা বলল না। বাজপাখির ক্ষিপ্রতায় ঝুমার কপালের মাঝখানে রিভলবারের নল চেপে ধরল। ভয় পেল না ঝুমা। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, মানুষ চেনার দক্ষতা নেই। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ব্যাবসা করবে?

তারপর রিভলবারসহ বিশালের হাত সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে পুনরায় বলল, তোমাকে খুন করার ইচ্ছা থাকলে অনেক আগেই করতে পারতাম। পুরুষ মানুষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, বিশেষ কিছু মুহূর্তে মেয়েরা তাদের পুঁটিমাছের মতো টিপে মারতে পারে। আমি কি সেই সুযোগ পাইনি?

খাট থেকে নেমে দাঁড়াল ঝুমা। বিশাল তখনও সম্মোহিতের মতো তার দিকে চেয়ে আছে।

— হাঁ করে কী দেখছ? ওঠো। লাশটা সরিয়ে ফেলতে হবে তো?

ঝুমার কথায় সংবিত ফিরে পেল বিশাল। মেঝেয় পড়ে থাকা সোমনাথের নিথর দেহটার দিকে তাকাল মুহূর্তের জন্য। তারপর রিভলবারখানা কোমরে গুঁজে নিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

এঘর ওঘর খুঁজে লম্বা পলিথিন সিট ও একটা চটের বস্তা নিয়ে এল ঝুমা। দুজনে মিলে মৃতদেহ পলিথিনের সিটে জড়িয়ে চটের বস্তায় ভরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে দমকা বাতাস আর বিদ্যুতের ঝলকানি। সে কী আলোর তীব্রতা, তেমনি পিলে চমকানো আওয়াজ। এই দুর্যোগের মাঝে রাস্তায় লোকজন থাকার কথা নয়। ছিলও না। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে গঙ্গাব্রিজে উঠে লাশটা ছুড়ে ফেলে দিল অথই জলের মাঝে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিকেলের দিকে চরণ একজনকে নিয়ে এল। জলঙ্গীর ওদিকে বাড়ি। আটাশ-তিরিশের সুঠাম যুবক। শ্যামলা গায়ের রং, কাটা কাটা মুখশ্রী। মাথা ভরতি উশকোখুশকো চুল,

কতদিন তেল-সাবান পড়েনি সেই জানে। ছেলেটির উপর-পাটির সামনের একটি দাঁত ভাঙা।

— কী নাম? জানতে চাইল বিশাল।

— জি লিয়াকত সেখ।

— লিখতে-পড়তে পারো?

— জি স্যার! দু-বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছি, পাশ করতে পারিনি।

— বাড়িতে কে কে আছে?

— বিবি, পাঁচ বছরের একটি ছেলে আর বুড়ি মা। মা একদম চলাফেরা করতে পারে না।

— ওহ্, কাজ করতে চাও আমাদের গ্রুপে? আমাদের ব্যাবসা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?

— আমি একটু হিন্ট দিয়েছি। বলল চরণ।

— আমাদের গ্রুপে কাজ করতে হলে মাথায় কাফন বেঁধে ঘুরতে হবে। বন্দুক চালানো জানতে হবে, পুলিশের সঙ্গে লড়তে হবে। খুন করতে হতে পারে, আবার খুন হয়েও যেতে পারো। ভালো করে ভেবে দ্যাখো সবদিক, তারপর জানাও।

— ভাবার কিছু নেই স্যার। সবকিছু জেনেই আমি এসেছি।

— ছ-মাস জেল খেটেছে লিয়াকত। বলল চরণ।

— সে একটা অন্য কেসে স্যার। আমাদের পাড়ায় একটা বিধবা বউ আছে, খুব সুন্দর দেখতে। লোভ সামলাতে পারিনি, একরাতে জোর করে...। হেঁ হেঁ হেঁ।

— এখানে ওসব চলবে না। মেয়েমানুষ নিয়ে বেল্লেলাপনা একদম পছন্দ করি না আমি। তবে যদি কোনো মেয়ে নিজে থেকে ধরা দেয়...

— আপনার কথা মনে রাখব স্যার।

— তাতে তোমারই মঙ্গল। চরণ ওকে নিয়ে গিয়ে কাজ বুঝিয়ে দে।

চরণ লিয়াকতকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিশাল উঠে গিয়ে টেলিফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এসটিডি কল। মায়ানমারের মি. চেন চেমিং বড়ো মাপের ড্রাগস ডিলার। বিশাল তার কাছ থেকে মাল কেনে। ভদ্রলোক ক-দিন আগে ফোন করে জানিয়েছিলেন সে দেশের সামরিক সরকার ড্রাগস নিয়ে ব্যাপক কড়াকড়ি শুরু করেছে। পরিস্থিতি উন্নত হল কিনা জানা দরকার। তা না হলে অন্য পার্টির কাছ থেকে মাল আমদানি করতে হবে।

অনেক চেষ্টা করেও মি. চেমিংকে ধরা গেল না। অগত্যা ফোন রেখে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল বিশাল। এমন সময় একটি লোক এসে সামনে দাঁড়ালেন, গুড আফটারনুন স্যার।

— আরে চারুবাবু যে। আসুন আসুন। বসুন। তারপর বলুন খবরাখবর সব ভালোতো? আধপোড়া সিগারেটটি অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে সোজা হয়ে বসল বিশাল।

চারু ভৌমিক বিশালের নতুন আবিষ্কার। কল্যাণী ড্রাগসের ম্যানেজার। অর্থলোভী পাষণ্ড একটা। আমদানিকৃত মাল গোপনে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি তা কল্যাণী ড্রাগসের কার্টনে প্যাক করে পুনরায় এখানে পাঠিয়ে দেন। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিনিময়ে মাসে দশ হাজার টাকা দিতে হয় তাঁকে।

— সব ঠিক থাকলে আর ছুটে আসতে হল কেন মশাই। আসন গ্রহণ করে বললেন চারুবাবু।

— এনি প্রবলেম?

— স্যার ল্যাংচার রসে মাখামাখি হয়ে আমার যে ল্যাজেগোবরে অবস্থা।

— কী রকম?

— আজ্ঞে! কল্যাণী ড্রাগসের কার্টনে ভরে আপনি মাল ডেলিভারি করেন ব্যাটা কীভাবে জানতে পেরেছে। মাসোহারা চাইছে, না পেলে মালিককে জানিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে।

— কে এই ল্যাংচা?

— খাগড়া স্টেশনপাড়ায় নতুন গজিয়েছে এই দৌরাত্ম্য।

— হুম্! থাকে কোথায় ছেলেটা?

— গুন্ডা বদমায়েশের আবার থাকার জায়গা? হবে কোনো বস্তির কীট। শুনেছি স্টেশন লাগোয়া মন্দির চত্বরে অনেক রাত অবধি দলবল নিয়ে আড্ডা দেয়।

— মন্দিরে আড্ডা দেয়! পাবলিক প্রোটেস্ট করে না?

— এলাকার মানুষ ওকে যমের মতো ভয় পায়। ইচ্ছে থাকলেও সাহস করে কেউ ওর সামনে দাঁড়াতে পারে না। আপনি কিছু একটা বিহিত করুন।

— হুম্! দেখছি কী করা যায়। বিশাল ড্রয়ার থেকে হাজার টাকার একখানা নোট বার করে চারুবাবুর হাতে দিয়ে পুনরায় বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে থাকুন। এদিকটা আমি দেখছি। কোনো প্রবলেম দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।

চারুবাবু নোটখানি পকেটে ভরতে ভরতে বিগলিত হয়ে বললেন, তা আর বলতে হবে না স্যার। আপনি মাথার উপর আছেন, তখন আমার আর চিন্তা কী?

বিশাল খাতাপত্র টেনে নিয়ে আবার কাজে মনোনিবেশ করল। কাজ করতে করতে হঠাৎ খেয়াল করে চারুবাবু তখনও বসে আছেন। মনে মনে বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করল না। জানতে চাইল, আর কিছু বললেন?

— ও ইয়ে মানে! আগামী মাসে ছোটোমেয়ের বিয়ে। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন চারুবাবু।

— বাহ! গুড নিউজ। হাসার চেষ্টা করল বিশাল।

— ছেলে সরকারি চাকুরে। অনেক ডিমান্ড ওদের।

— তাতে কী? মেয়ে সুখে থাকলে সব ঠিক আছে।

— গত বছর মেজোমেয়ের বিয়ে দিলাম, লাখ তিনেক টাকা খসে গেল। তারপর এটা, পেরে উঠছি না স্যার।

— আমি না হয় হাজার বিশেক দেব।

— আজ্ঞে!

— আপনি আমার নিজের লোক। আপনার জন্য এটুকু করার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে?

— আপনি মহানুভব। আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না আমি।

— বিয়ের দু-তিনদিন আগে জানাবেন। কারও হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

চারুবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বিশাল বলল, আর কখনও এখানে আসবেন না। লোকে সন্দেহ করবে।

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে চারুবাবু চলে গেলেন। বিশাল লিয়াকতের নাম ধরে ডাক দিল। সে এলে পরে বলল, মহিলা সমিতির নুরুন্নেহার বেগমকে চেনো? ওই যে বাটা শোরুমের পাশেই ওদের অফিস।

— জি স্যার। ক-দিন আগেই উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। খুব ফিটফাট থাকেন। ফটফট করে ইংরেজি বলেন।

বিশাল ড্রয়ার থেকে একশো টাকা নোটের দুটো বান্ডিল বার করে তার হাতে দিয়ে বলল, টাকাগুলো ভদ্রমহিলাকে দিয়ে এসো। আর বলবে আমি ওদের অনুষ্ঠানে যেতে পারব না। অন্য কাউকে সভাপতি করে কাজ চালিয়ে নেন যেন।

— জি স্যার। লিয়াকত বিদায় হলে পরে বিশাল পুনরায় খাতাপত্রে ডুব দিল।

রাত এগারোটার পর বিশাল মোটরবাইক নিয়ে পথে নামল। সঙ্গে চরণ। দুজনেই মাথায় ফুল হেলমেট চড়িয়েছে, চট করে কেউ যাতে চিনতে না পারে।

স্টেশন চত্বরে ঢোকার আগে শিবমন্দির। পুরোনো মন্দিরের অনতিদূরে নতুন মন্দির গড়ে উঠেছে। শিবঠাকুরও পুরোনো আস্তানা ছেড়ে নতুনটায় থিতু হয়েছেন। এই অবসরে ল্যাংচা পুরোনো মন্দিরের দখল নিয়েছে। আজ কিন্তু সেখানে কারও দেখা পাওয়া গেল না।

নতুন মন্দিরের চাতালে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন বৃদ্ধ পুরোহিত। থেকে থেকে পায়ে-পাছায় চাপড় মারছেন, মুখমণ্ডলে হাত বোলাচ্ছেন। সম্ভবত মশা কামড়াচ্ছে তাঁকে। পুরোনো মন্দির ছেড়ে বিশালরা পুরোহিতের কাছে গেল। ল্যাংচার

খোঁজ করলে তিনি যেন শুনতে পাননি, পূর্ববৎ শুয়ে রইলেন। তারপর বিশাল অনেক অনুনয়-বিনয় করল। কিছুতেই কিছু কাজ হল না। শেষমেষ বিশাল জোর করে পাঁচশো টাকার একখানা নোট যখন তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল, তখন উঠে বসলেন পুরোহিত ঠাকুর।

— ও একটা নরকের কীট। মেয়েমানুষ এনে ফূর্তি করে। মদ খায়। মানা করলে তেড়ে মারতে আসে। সন্ধ্যার পর পাড়ার মেয়েরা ওর ভয়ে রাস্তায় বের হতে ভয় পায়।

— কোথায় গেলে ওর দেখা পাওয়া যাবে বাবা? জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— আম্বেদকর বস্তিতে নয়নতারা নামে একটি মেয়ে থাকে। শুনেছি পাপিষ্ঠ মাঝে মাঝে ওখানে যায়, রাতে থাকে। তোমরা ওখানে খোঁজ করতে পারো।

পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা আম্বেদকর বস্তির দিকে ছুটে চলল। জাতীয় সড়কের উত্তরে, ভাগীরথী নদীর পূর্বপাড়ে আম্বেদকর বস্তি। মিনিট বিশেকের মধ্যে তারা সেখানে পৌঁছে গেল। পায়রার খোপের মতো ছোটো ছোটো ঘর। অধিকাংশই টালির ছাউনি দেওয়া। কোথায় খুঁজবে নয়নতারাকে?

গলির মুখে বাইক রেখে বস্তির ভিতরে ঢুকল। খানিকটা গিয়ে দেখতে পেল এক মহিলা বদনা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক কৃত্য সারতে বেরিয়েছে হয়তো। অচেনা মানুষ দেখে সে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। বিশাল ডেকে নয়নতারার ঘর কোনটা জানতে চাইল। মহিলা ঝুপড়িটা দেখিয়ে দিল।

দরজায় টিনের চাদরের কপাট। বিশাল টোকা দিল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বার টোকা দিতে ফাটা কলসির মতো খনখনে গলায় কেউ গালাগালি দিয়ে উঠল, ফের কোন ড্যামনার ব্যাটা জ্বালাতে এলি?

তার মানে আগে কেউ এসেছিল, চলে গেছে। ল্যাংচা নয়তো? কী জানি হবেও বা। তবে কি আজ আর তাকে পাওয়া যাবে না? চরণ বলল, পাই না পাই খোঁজ নিলে দোষ কী? কথা বল।

— নয়ন দরজা খোলো। কপাটে আঘাত করে বলল বিশাল।

— আহ! মরি শালাদের জ্বালায়। বলি আমি মানুষ না যন্তর যে...। নয়নতারা কপাট খুলে খ্যানখেনে গলায় জিজ্ঞাসা করল, কে তোমরা? কী চাই এখানে?

— আমরা ল্যাংচার বন্ধু। ও আমাদের এখানে আসতে বলেছে। আসেনি ও?

মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে বলল, এটা ময়রার দোকান নাকি যে ল্যাংচা-রসগোল্লা থাকবে? ভাগো এখান থেকে, তা না হলে চিল্লে লোক জড়ো করব?

— আহা চটছ কেন? ল্যাংচা তোমার খুব নাম করে তাই আমরা এসেছি। রাতটা তোমাকে নিয়ে...।

— তোমরা ল্যাংচার বন্ধু নও। কে তোমরা? ল্যাংচার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার?

নয়নতারা বিশালকে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বের হতে গেলে চরণ জাপটে ধরল। তলপেটে চাকু ঠেকিয়ে বলল, শালি! খুব চর্বি হয়েছে? বল ল্যাংচা কোথায়, তা না হলে ছ-ইঞ্চি পুরোটা পেটে গেঁথে দেব।

ঠিক তখনই পিছনদিক থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কোন শালা ল্যাংচাকে নিয়ে লাফরা করছিস রে?

বেচারা ল্যাংচা সতর্ক হবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না। বিশালরা একযোগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নবম পরিচ্ছেদ

ড্রিমনাইট বার। শহরের একমাত্র বার। সেখানে স্বল্পবসনা সুন্দরীরা নৃত্য করে, মদের ফোয়ারা ছোটে, ইত্যাদি নানা কথা লোকমুখে শুনে এসেছে বিশাল। কোনোদিন প্রবেশ করার সুযোগ হয়নি। আসলে পকেট পারমিট করেনি। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অনুকূলে। বারমালিক বয়ে এসে আমন্ত্রণ করে যায়। গাড়ি আসে নিয়ে যেতে।

মিস রুমানা নামে একটি নতুন মেয়ে আমদানি করেছে বারমালিক নীতিন জৈন। মুম্বাইয়ের মেয়ে। ক-দিন আগে মিস্টার জৈনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দূর থেকে মেয়েটাকে দেখে এসেছে বিশাল। যেমন তার রূপ, তেমনি ফিগার। যৌবন যেন ঠিকরে পড়ছে। এই মেয়ে যখন স্বল্পবাসে শরীর দুলিয়ে নাচে, তখন দর্শক আসনে উপবিষ্ট আঠারো থেকে আশির মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে উন্নীত হয় অনুমান করা খুব একটা কঠিন নয়। ইচ্ছা থাকলেও সেদিন ব্যস্ততার কারণে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করা হয়ে ওঠেনি, প্রয়োজনীয় কথা সেরে চলে আসতে হয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যে সুযোগ এসে গেল। বারমালিক নিজেই আহ্বান করেছেন।

বিশাল পৌঁছোল যখন, তখনও শো শুরু হয়নি। নানা বয়সি মানুষের ভিড়ে ঠাসা হলঘর, বেশ কিছু মেয়েও আছে। অধিকাংশই লাইনের মেয়ে। কাউকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। কেউ বা শো শেষে খদ্দের ধরার অভিলাষ নিয়ে প্রহর গুনছে।

হলঘরের লাইট ডিম করে দেওয়া হয়েছে। দর্শকের আসনে পরিচিত কেউ বসে থাকলেও সঠিকভাবে চেনার উপার নেই। নীতিনবাবু খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন। বিশালকে প্রায় হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়ে বসালেন ভিআইপি কেবিনে।

— ঠান্ডা-গরম কিছু দেব বিশালবাবু?

— জাস্ট হুইস্কি।

ফুল ভলিউমে ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে।

মিনিট কয়েক বাদে দর্শক আসনের দিকের লাইট দপ করে নিভে গিয়ে স্টেজে রঙিন আলোর খেলা শুরু হল। মস্ত বড়ো একটা পদ্মের কুঁড়ি ছাদ ফুঁড়ে আলোর বন্যায় ভাসতে ভাসতে নেমে এসে স্টেজের মেঝে স্পর্শ করল। অতঃপর ধীরে ধীরে পদ্মের পাপড়ি খুলে যেতে দেখা গেল একমুখ স্বর্গীয় হাসি নিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় বসে আছে একটি মেয়ে।

রুমানা। রুমানা। রুমানা।...

প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল হল। মিস রুমানা সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন গ্রহণ করে একটা ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিল। তারপর সোজা হয়ে দু-দিকে দু-হাত প্রসারিত করে মিউজিকের তালে তালে পায়ের পাতা থেকে চোখের মণি নাচাতে শুরু করল, যেন পাহাড়ের গা বেয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে উষ্ণ বারিধারা।

নীতিনবাবু আশেপাশে কোথাও ছিলেন। শো শেষ হতে উদয় হলেন। বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন, শো কেমন লাগল বিশালবাবু?

— অনবদ্য! তুলনা হয় না। এই মেয়েকে কিছুদিন ধরে রাখতে পারলে আর দেখতে হবে না মশাই, মালামাল হয়ে যাবেন।

— সব আপনাদের আশীর্বাদ। গদগদ হয়ে বললেন নীতিনবাবু।

— রুমানার সঙ্গে পরিচয় করাবেন না?

— অবশ্যই। আপনি দেখা করবেন সে তো রুমানার সৌভাগ্য। আসুন আমার সঙ্গে।

পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করল দুজনে। স্টেজের পোশাক পরেই বসে আছে রুমানা। একঘন্টার নৃত্য প্রদর্শন। শরীরের উপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। ঘেমেনেয়ে একশা অবস্থা। বিশালদের দেখে তাড়াতাড়ি একটা চাদর টেনে নিয়ে শরীর আবৃত করল সে।

— রুমানা ইনি বিশালবাবু, বড়ো বিজনেসম্যান।

হঠাৎ করে রুমানার মুখের আদল পালটে গেল। ফুলের মতো নরম মুখশ্রী মুহূর্তে ইস্পাত কঠিনে পরিণত হল। চোখজোড়া দপ করে জ্বলে উঠল। বিষয়টা নীতিনবাবুর চোখ এড়িয়ে গেলেও বিশাল ঠিক ধরে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় খেলে গেল একটি জিজ্ঞাসা, আমার নাম শুনে মেয়েটি চমকাল কেন?

মুখে সে কথা প্রকাশ না করে রুমানাকে উদ্দেশ করে বলল, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার অসুবিধা আছে? থাকলে বলো, বিরক্ত না করে চলে যাব।

— না, না। কীসের অসুবিধা? আপনি বসুন, আমি চট করে পোশাক পালটে আসছি। রুমানা উঠে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

নীতিনবাবু তখন বললেন, আপনারা কথা বলুন। ততক্ষণ আমি একটি জরুরি কাজে সেরে নিই।

— ওকে! আসুন।

মিনিট দশেকের মধ্যে রুমানার প্রত্যাগমন ঘটল। গায়ে হালকা গোলাপি কালারের একটি নাইট গাউন চাপিয়েছে। এই পোশাকে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বিশাল তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকে।

— আপনার কথা অনেক শুনেছি। উলটোদিকের সোফায় বসতে বসতে বলল রুমানা।

চমক দিয়ে ঘোর কাটে বিশালের।

মৃদু হাসল রুমানা। তারপর বলল, বড়ো বিজনেসম্যান। এলাকায় আপনার অনেক খাতির। এমনকি পুলিশও আপনাকে সমীহ করে চলে।

— এখানে আসা একমাস হয়নি। এর মধ্যে আমার সম্পর্কে এত খোঁজখবর নিয়েছ। আমার সম্পর্কে তোমার বেশ আগ্রহ আছে দেখছি। কী ব্যাপার বলোতো?

— বড়ো মানুষের কথা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। আমি তার কয়েকটা সংগ্রহ করেছি মাত্র।

এনিওয়ে, কেমন লাগল আমার আজকের পারফরমেন্স?

— অনবদ্য। তুলনাহীন।

— ব্লাফ দিচ্ছেন? ভ্রূকুটি করে বলল রুমানা।

— তোমার প্রেমে পড়িনি। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থও নেই। ব্লাফ দিতে যাব কেন? যা সত্যি তাই বলছি। এতদিন বারে আসছি, এমন নাচ দেখিনি। বাই দ্য ওয়ে, কার কাছে নাচ শিখেছ?

— ক্যাবারে ডান্স শিখতে হয় না বিশালবাবু। কয়েকটা ফিল্‌মি ডান্স কপি করে নিলেই হল। কেউ তো আমাদের নাচ দেখে না, স্বল্প পোশাকে নারীদেহ দেখে ক্ষুধা বাড়াতে আসে। ক্যাবারে ডান্সাররা হল গিয়ে কামোত্তেজক পিল।

— আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। অনেকে শুধু নাচ দেখে পরিতৃপ্ত হয়।

— আপনার মতো আর ক-টা মানুষ আছে?

এ-কথার উত্তরে কিছু বলল না বিশাল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, সর্বনাশ! রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। আজ আসি।

— আসুন। আপনার অপেক্ষায় থাকব। উঠে দাঁড়িয়ে বিশালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রুমানা। হ্যান্ডসেক না করে বিশাল হাত তুলে গুড নাইট জানাল। তারপর দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

দশম পরিচ্ছেদ

অবিনাশবাবুর হয়ে কাজ করার সময় বিশাল কাদাই অঞ্চলে একটি ফ্ল্যাট নিয়েছিল। রঙিন টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ইত্যাদি আধুনিক আসবাবপত্রে ফ্ল্যাট সাজিয়ে তবে মা-কে নিয়ে এসেছে। দেখেশুনে ভারতী একেবারে থ।

— এত বড়ো বাড়ি, এত আসবাব! সব আমাদের?

— হ্যাঁ মা! সব তোমার।

— এত টাকা তুই কোথায় পেলি খোকা? মাত্র তিন হাজার টাকা মাইনে পাস। কড়াগন্ডার বাজারে ওই টাকা দিয়ে ঠিকমতো সংসার চলে না। সেখানে তুই...

— ওরে আমার পাগলি মা। আসবাবপত্র একটাও আমার কেনা নয়। সব কোম্পানি দিয়েছে। তবে ফ্লাটটা আমি তোমার নামেই কিনেছি।

সেদিনের বিশালের সঙ্গে আজকের বিশালের তফাত আকাশ-পাতাল। তখন মাল ডেলিভারি করার মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সে-ই ব্যাবসার কর্ণধার। মাল আমদানি, খদ্দেরের হাতে পৌঁছে দেওয়া, হিসাবপত্র দেখা, পুলিশ সামলানো, শত্রুর মোকাবেলা করা, সবকিছু তাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কাজের চাপে কোনোদিন ঘরে ফেরা হয়, কোনোদিন হয় না। কাজের মেয়েকে নিয়ে থাকতে হয় মাকে। এ নিয়ে মায়ের অভিযোগের শেষ নেই।

— আজকাল তুই ঠিকঠাক বাড়ি ফিরিস না। কোথায় থাকিস, কী খাস, আমার বুঝি চিন্তা হয় না?

— আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি মা। কিন্তু কাজের চাপ এত বেড়েছে যে তোমাকে মোটেই সময় দিতে পারি না। লক্ষ্মী মা আমার আর ক-টা দিন সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

— এত বড়ো বাড়িতে একা থাকি, ভাল্লাগে না আমার। এবার তুই বিয়ে কর খোকা। বাড়িতে বউমা এলে একাকিত্ব কাটবে, গল্পগুজব করে সময় কাটাতে পারব।

— মা আজকালকার মেয়েরা মোটেই সুবিধার নয়। ভয় করে যদি তোমার-আমার মাঝে...

— পাগল ছেলে আগুনে ঘর পোড়ে বলে কি উনুন জ্বালাতে হবে না? ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে একটা মেয়ে দেখ। একটু থেমে আবারও বলল, কাউকে পছন্দ হয়ে থাকলে আমাকে বল, যোগাযোগ করব।

— না মা তেমন কেউ নেই। তবে তুমি বলছ যখন খুঁজব কাউকে।

বিয়ে করার কথা তেমন করে কোনোদিন ভাবেনি বিশাল। কাজ কাজ করে মেতে

থেকেছে। এখন মায়ের কথায় সেই বিষয়ে ভাবতে গিয়ে প্রথমে রুমানার মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিখুঁত সুন্দরী, তন্বী তরুণী। বারে নাচে। সেটা তেমন দোষের নয়। আজকাল নাচগানকে হাতিয়ার করে কত ছেলেমেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। বিয়ের পর না নাচলেই হল।

পত্রপাঠ বিশালের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে রুমানা বলল, যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে আমার। জেনেশুনে বিষ পান করব কেন?

— হোয়াট ডু য়ু মিন?

— আপনার যা কারবার তাতে যে কোনো সময় পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারেন অথবা লাইফ টাইমের জন্য জেলে যেতে হতে পারে। যেখানে আপনার নিজের জীবনের নিশ্চয়তা নেই, সেখানে আপনাকে বিয়ে করে আত্মাহুতি দিতে যাব কোন দুঃখে?

রুমানার কথাগুলো বন্দুকের গুলির মতো বুকে বিঁধলেও বিশাল উপলব্ধি করে অন্যায্য কিছু বলেনি সে। সত্যি তো তার জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সে আরও উপলব্ধি করে ভদ্রঘরের কোনো মেয়েকে তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হবে না। ড্রাগসের ব্যাপারী, সমাজবিরোধী সে। তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হোক চাইবে না কোনো বাবা। কিন্তু সে যে মাকে কথা দিয়েছে। তার কী হবে? সবদিক ভেবেচিন্তে এক সন্ধ্যায় ঝুমাকে বলল, আমার একটা কথা রাখবে?

— বলো, সম্ভব হলে না করব না।

— মা বিয়ে করার জন্য খুব চাপাচাপি করছে।

— ভালোই তো! একটা মেয়ে খুঁজে নিয়ে করে ফ্যালো তাড়াতাড়ি।

— তুমি কি পারো না আমার বউ হয়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে?

— প্লিজ আমাকে আর অভিনয় করতে বোলো না বিশাল।

— না, না! অভিনয় করতে হবে কেন? আমি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলব। লক্ষ্মীটি অমত কোরো না। ঝুমার হাতদুটো চেপে ধরে বলল বিশাল।

— তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ডক্টর হাসানের কাছে যাও। মাথার চিকিৎসা করাও।

— আমি প্রলাপ বকছি না, অতিরিক্ত নেশাও করিনি। সজ্ঞানে, সুস্থ মাথায় প্রস্তাব রেখেছি। কোনো জোরজবরদস্তি নেই, তুমি না করতেই পারো।

— মাসিমা অনেক আশা নিয়ে সোমনাথের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল। স্বপ্ন আমিও কম দেখিনি। বিনিময়ে কী পেলাম? সোমনাথ আমাকে অবিনাশের হাতে তুলে দিয়েছে। জন্ম-নিরোধক পিল খেয়ে রাতের পর রাত ওর অত্যাচার সহ্য করেছি। এখন তুমি এসেছ জীবনে। এইভাবেই কাটুকনা দিন।

— আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো ঝুমা। তোমাকে আর জন্ম-নিরোধক পিল খেয়ে বিছানায় যেতে হবে না। মা হতে পারবে তুমি।

— না। চিৎকার করে উঠে পালিয়ে যেতে চাইল ঝুমা। বিশাল তার একটা হাত চেপে ধরলে পুনরায় সে বলল, আমি নষ্ট মেয়েমানুষ। আমাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে তোমার রুচিতে আটকাবে না।

বিশাল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, আজ থেকে তুমি আমার এখানে থাকবে। শুধু একটা অনুরোধ...

— বলো?

— মা আমার বড়ো দুঃখী। পৃথিবীতে আমি ছাড়া তার কেউ নেই। কথা দাও তুমি এমন কোনো আচরণ করবে না যাতে মা আঘাত পায়।

— মাকে খুব ভালোবাসো?

— নিজের থেকেও বেশি। মা আমার জীবনের শেষ কথা। জানি না আমার বাবা কে! মা তার অভাব বুঝতে দেয়নি কোনোদিন। একটু থেমে আরও বলল, শুনেছি লালগোলার ওদিকে কোনো এক গ্রামে মায়ের বাবার বাড়ি। বাড়িতে ঝগড়া করে পালিয়ে এসে মা সুইসাইড করতে গিয়েছিল। এক মুসলমান মাঝি তাকে বাঁচায়। আমি তখন গর্ভে। কেউ না বললেও জানি, আমি কুমারী মায়ের সন্তান।

বলতে বলতে বিশালের চোখ ভিজে যায়। ঝুমা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়।

— এখন থাক ওসব কথা। বলো কবে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে?

— তুমি বললে কালই।

— সত্যি বলছ? আমার আর তর সইছে নাগো।

চরণের মত ছিল না এই বিয়েতে। ভালো একটা মেয়ে দেখে দেবে এমন কথাও বলেছিল সে। বিশাল তার কথায় কান দেয়নি। তিনদিনের মাথায় তারাপীঠ মন্দিরে গিয়ে ঝুমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে সোজা হাজির হল মায়ের দরবারে।

— মা তোমার জন্য স্পেশাল গিফট এনেছি। বলোতো কী এমন জিনিস এনেছি তোমার জন্য?

— দ্যাখো ছেলের কাণ্ড! না দেখে কী করে বলি?

— দেখবে বলছ! দেখাই তাহলে। কইগো সামনে এসে মুখখানা দেখাও দেখি।

ঝুমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। বিশাল তার একটা হাত ধরে টেনে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, তোমার জন্য এনেছি মা। পছন্দ না হলে বলো এখনই ফেরত দিয়ে আসছি।

হঠাৎ করে ভারতীর মুখে কথা জোগাল না। নববধূ সাজে সজ্জিত ঝুমার মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ঝুমা শাশুড়িকে প্রণাম করতে গেলে সংবিত ফিরে পেল সে। তাড়াতাড়ি বউমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলছি বউমা। আগে এই বদমায়েশটার বিচার করি।

— ও মাগো! আজকের দিনে আবার বিচার কেন? তুমি বলেছিলে তাই নিয়ে এলাম।

— সেদিন তুই কী বলেছিলি? কেউ নেই। দু-দিনের মধ্যে আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে বুঝি? বউমা তুমিই বলো, দেখি ব্যাপারটা কী?

প্রমাদ গোনে ঝুমা। এবার বুঝি সব ফাঁস হয়ে যাবে। আতঙ্কিত হয়ে সে বিশালের দিকে তাকাল। বিশাল এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, তোমার পছন্দ হয়েছে মা?

ভারতী মুচকি হেসে বউমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, না হয়ে যাবে কোথায়? আহা! মুখখানা কী মিষ্টি! আমিতো এমনই একটা বউমার স্বপ্ন দেখেছি।

— দেখতে হবে কার পছন্দ। বিশাল একলাফে মায়ের সামনে এসে বুক টান করে দাঁড়িয়ে বলল, ও কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে মা?

তারপর আর কী! বউমাকে বরণ করে ভিতরে নিয়ে গেল ভারতী। এই বিয়েতে তার বাড়ির সকলের মত আছে কিনা জানতে চাইল। তখন বিশাল বলল, ওর নিজের বলতে কেউ নেই মা। বাবা-মা পথ দুর্ঘটনায় মারা যায় তখন ও খুব ছোটো। বরানগরে ওর এক মাসি থাকেন। ঝুমা তার কাছেই বড়ো হয়েছে।

— এখন থেকে আপনিই আমার মা। আপনার কাছ থেকে মায়ের আদর ভালোবাসা আদায় করে নেব আমি।

— তা নেবে বইকি মা। তোমার সে অধিকার আছে।

— মা! এবার আর কোনো আপত্তি শুনল না ঝুমা, শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ঠিক তখনই বোমাটি ফাটাল ভারতী। হঠাৎ করে বিশালের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল, খোকা একটা কথা আমার মাথায় কিছুতেই আসছে না। বউমা বরানগরের মেয়ে। তোর সঙ্গে তার পরিচয় হল কী করে?

এই সেরেছে! মিথ্যের পর মিথ্যে। কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ঈশ্বর জানেন। শেষমেশ না কেলেংকারি ঘটে যায়? জুতসই উত্তর তৈরি করতে না পেরে ঘামতে শুরু করেছে সে। স্বামীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল ঝুমা। লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, আপনার ছেলে আর আমি এক কোম্পানিতে কাজ করি। আমাদের সম্পর্ক প্রায় দু-বছরের।

— ওহ্।

— কী হল মা?

— অ্যাদ্দিন যা হয়েছে হয়েছে। বউমা আর চাকরি করতে যাবে না। আমি যেতে দেব না।

— ঠিক বলেছেন মা। আমি শুধু আপনার সেবা করব। শাশুড়ির কোলে মাথা রেখে বলল ঝুমা।

রিং রিং করে মোবাইল ফোনটা আর্তনাদ করে উঠতে বিশালের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। কল রিসিভ করে হ্যালো করলে ওপার থেকে বহরমপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গোলদারবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বিশালবাবু এবার মনে হয় আপনি ফেঁসে গেলেন।

— ফেঁসে গেলাম মানে! কী হয়েছে?

— ক-দিন আগে আম্বেদকর বস্তিতে একটা ছেলে খুন হয়েছে। কী যেন নাম ছেলেটার? ও হ্যাঁ, ল্যাংচা।

— তো?

— এসপি সাধন দত্ত আপনাকে সন্দেহ করছেন।

— মগের মুলুক নাকি! উনি বললেই হল? আমি কোনো ল্যাংচা-পান্তুয়াকে চিনি না, খুন করার প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? সে কি আমার রাইভ্যাল ছিল? আপনার এসপিকে বলে দেবেন আমি ব্যাবসা করি, মস্তানি করি না।

— নয়নতারা নামের একটি মেয়ে ল্যাংচা খুনের প্রত্যক্ষদর্শী। সে খুনিদের যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে...

— কী!

— আপনার আর চরণবাবুর সঙ্গে হুবহু...

— বাজে কথা! এসব এসপি সাধন দত্তের চালাকি। আমাকে ফাঁসানোর জন্য মেয়েটাকে দিয়ে এই কথা বলানো হচ্ছে।

— আপনাকে জানানো দরকার মনে হল তাই...। এসপি কিন্তু উঠেপড়ে লেগেছেন। সাবধানে থাকবেন। গোলদারবাবু ফোন কেটে দিলেন।

মোবাইল সেটটা টেবিলের উপর রেখে বিশাল চোখ বন্ধ করে চুপচাপ সেখানেই বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর চরণকে ডেকে বলল, ল্যাংচা খুনের ব্যাপারে এসপি আমাদের সন্দেহ করছেন। নয়নতারা নাকি আমাদের কথা বলেছে।

— কী হবে এখন?

— বস্তিতে যা। মেয়েটাকে তুলে আন। তারপর যা করার আমি করব।

চরণ কথা না বাড়িয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মোবাইল ফোনের শব্দে বিশালের ঘুম ভেঙে গেল। খানিকটা বিরক্ত হয়েই কল রিসিভ করল সে। ওপার থেকে নীতিন জৈনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একবার বারে আসবেন প্লিজ।

— এখন! কী ব্যাপার বলুন তো?

— খুব ফেঁসে গেছি বিশালবাবু। সব কথা ফোনে বলতে পারছি না। আধঘন্টার মধ্যে চলে আসুন প্লিজ।

মায়ানমারের চেং চেমিন ক-দিন আগে জানিয়েছিলেন, সে দেশের সামরিক সরকার ড্রাগসের ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি শুরু করছে। কোনোভাবেই মাল ডেলিভারি করা সম্ভব নয়। মাঝে বিশাল তাঁকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিল, যান্ত্রিক গোলযোগে তা হয়ে ওঠেনি। পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হতে মিস্টার চেমিন সশরীরে এসে শিলিগুড়িতে ডেরা বাঁধেন।

এদিক থেকে বিশাল গিয়ে পৌঁছোয় সেখানে। বিস্তারিত আলোচনার পর স্থির হয়েছে মাসে একটি মাত্র ডিল সম্পন্ন হবে, তাও সামান্য পরিমাণে। মাসিক বিশ থেকে পঁচিশ কেজি মালের প্রয়োজন। সেখানে পাঁচ-সাত কেজির বেশি দিতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। তবে চিনের এক পার্টির সন্ধান দিয়েছেন তিনি, তার কনট্যাক্ট নম্বরও দিয়েছেন।

ইচ্ছা করলে পরদিন ফিরে আসতে পারত বিশাল। কিন্তু মায়াবী কাঞ্চনজঙ্ঘার আকর্ষণ উপেক্ষা করে আসতে পারেনি। দার্জিলিং ছুটে গিয়েছিল। সেখানে তিনদিন কাটিয়ে শেষরাতে শহরে ফিরেছে। বলতে গেলে কাঁচা ঘুমেই ছিল সে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। বাথরুমে গিয়ে স্নানটান করে ফ্রেশ হয়ে নিল। তারপর সামান্য জলখাবার মুখে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বাংলোয় এসে চরণকে তুলে নিয়ে ড্রিমনাইট বারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

নীতিনবাবু বারের প্রবেশদ্বারের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাইক্লোনে বিধ্বস্ত গাছের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখেমুখে চরম উৎকণ্ঠা। আছেন এসপি সাধন দত্ত, ওসি গোলদারবাবু। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আট-দশ জনের খাকি বাহিনী। বিশাল সেখানে পৌঁছে সকলকে সুপ্রভাত জানাল। নীতিনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, দেখুন দেখি কী ফ্যাসাদে পড়েছি। আমি একজন নিরীহ ব্যবসায়ী। আপনাদের আশীর্বাদে করেকম্মে খাই।

গাড়িতে আসতে আসতে চরণের মুখ থেকে ঘটনার কথা অল্পবিস্তর জেনেছে বিশাল। গত রাতে রুমানার প্রোগ্রাম ছিল। শো শেষে দর্শক হল থেকে বেরিয়ে আসতে

শুরু করছে। কেউ গাড়িতে উঠে বসেছে, কেউ বা গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় মেন গেটের সামনে পরপর দুটো বোম ব্লাস্ট। একজন স্পট ডেথ, ছেলেটি পৌরসভার সুইপার। আট-দশজন গুরুতর আহত। হাসপাতালের বেডে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তারা।

— রুমানা এখন কোথায়? বিশাল জানতে চাইল।

— ঘটনার পর থেকে ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বললেন নীতিনবাবু।

— মেয়েটা পালিয়েছে, নাকি তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আইসি গোলদারবাবু মন্তব্য করলেন।

— তাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব আপনাদের। দলবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়ুন। বলল বিশাল।

এসপি সাধন দত্ত এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বিশালকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দেখে চটে উঠলেন। মেজাজের সঙ্গে নীতিনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি? উনি পুলিশের লোক, না সিবিআই অফিসার? পুলিশের উপস্থিতিতে একজন অ্যান্টিসোস্যাল...

সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগার মতো কথা। বিশালের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে রাগ সংবরণ করে বলল, অফিসার সংযত হয়ে কথা বলুন। এখানে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। তাছাড়া এই ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

— তবে চুপ করে থাকুন। পুলিশের কাজে ইন্টারফিয়ার করবেন না। আমাদেরকে কাজ করতে দিন।

এসপির কথার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলল না বিশাল। দুই বাহু শক্ত করে বিশেষ ভঙ্গিমায় শরীর ঝাঁকিয়ে একপাশে সরে গেল। একজন বার-বয় চেয়ার এগিয়ে দিলে সেটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

বোম ব্লাস্ট হল হলের বাইরে আর রুমানা হারিয়ে গেল হলের ভিতর থেকে? মেয়েটি অতীব সুন্দর, তেমনই আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব। বদ পুরুষের কুনজর তার উপর পড়তেই পারে। বোম ব্লাস্ট করিয়ে লোকজনকে বিভ্রান্ত করে তুলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। প্রশ্ন হল বহরমপুর শহরে এত বুকের পাটা কার আছে যে এই কাজ করতে পারে?

এমনও হতে পারে রুমানা নিজেই এই ঘটনার কারিগর! কাউকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে এসেছিল, বারে নাচা বাহানামাত্র। কাজ হয়ে যেতে কেটে পড়েছে। একথা মাথায় আসতে রুমানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনার কথা বিশালের মনে পড়ে গেল। সেই রাতে মেয়েটা তার নাম শুনে চমকে উঠেছিল। কেন? তবে কি রুমানা আমাকেই খুন করতে...। ভাবনাটা মাথায় চেপে বসতে বিচলিত বোধ করল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল।

একটু বাদে এসপি দলবল নিয়ে চলে গেলেন। বিশাল দৌড়ে এসে নীতিনবাবুকে পাকড়াও করল। তিনি বললেন, হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটাতে সবাই দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল সবাই। কেউ বলতে পারছে না রুমানার সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছে। তবুও আপনি যখন বলছেন ওদের ডাকছি।

মালিকের ডাকে সবাই ছুটে এল। বিশাল এক এক করে সবার সঙ্গে কথা বলল। কেউ কোনো সূত্র দিতে পারল না। তখন সে নীতিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, এই শহরে রুমানার কোনো আত্মীয়স্বজন আছে?

— আমার জানা নেই।

— রুমানা মুম্বাইয়ের মেয়ে। আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হল কীভাবে?

— হঠাৎ করেই যোগাযোগ। একদিন ও একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বারে আসে। কথায়-কথায় জানতে পারি সে মুম্বাইয়ের বারে নাচে। আমি তাকে এখানে কাজ করার অফার দিই।

— তারপর?

— পারিশ্রমিকের কথা শুনে প্রথমে না করেছিলাম। ভেবে দেখলাম এই মেয়ে অ্যাটম বোম। ধরে রাখতে পারলে কপাল খুলে যাবে। তাই ওর দাবি মোতাবেক ডাবল দামেই রাজি হয়ে গেলাম।

— যে ছেলেটা ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল তার পরিচয়?

— খোঁজখবর নিইনি। তখন কি আর জানতাম...

— রুমানা এখানে কোথায় থাকত?

— বাবুলবোনা রোডে একটা ঘর আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। বাড়িভাড়া আমাকেই দিতে হয়।

উঠে দাঁড়াল বিশাল। নীতিনবাবুকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে গেল। মেন রাস্তার উপরেই একটা দোতলা পুরোনো বাড়ি। উপরতলার একটা ঘরে থাকত রুমানা। রাস্তার একপাশে গাড়ি রেখে ওরা এগিয়ে গেল। এক বৃদ্ধাকে সেখানে পাওয়া গেল, তিনিই বাড়ির মালিক। রুমানার কথা জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, রাতে মেয়েটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। তার মুখ দেখে মনে হয়েছিল খুব ভয় পেয়েছে। এসেই ব্যাগপত্র নিয়ে চলে গেল।

— ও কি আগে থেকেই ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছিল? জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— আমার তো তেমনই মনে হয়েছে। আমতা আমতা করে বললেন বৃদ্ধা।

— কোথায় গিয়েছে কিছু জানায়নি?

— জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনো উত্তর দেয়নি। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, উঠে চলে গেল। থামলেন বৃদ্ধা। তারপর নিরাশাজড়িত কণ্ঠে বললেন, মেয়েটাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। বুঝতে পারছি না সে কেন এভাবে চলে গেল।

— ট্যাক্সির নম্বর আপনার মনে আছে?

— না বাবা খেয়াল করিনি। সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার, পিছনের ডিকির ঢাকনা ছিল না। ড্রাইভারের মুখে দাড়ি আছে, গাট্টাগোটা ষণ্ডামার্কা চেহারা ছেলেটার। এতদূর বলার পর বৃদ্ধা নীতিনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ মাসের ভাড়াটা কিন্তু আপনাকে দিতে হবে।

— কত টাকা? জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— দু-হাজার। বললেন নীতিনবাবু।

পকেট থেকে পার্স বের করে চারখানা পাঁচশো টাকার নোট বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বিশাল বলল, ধন্যবাদ মাসিমা। আমাদের খুব উপকার করলেন।

বৃদ্ধা নোটগুলো ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললেন, হ্যাঁ বাবা মেয়েটার কোনো বিপদ হয়নি তো?

— সে যেন কোনো বিপদে না পড়ে সেই চেষ্টা করছি আমরা।

শহরের পূর্বপ্রান্তে চুয়াপুর। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের উভয় পাশে অনেকগুলো গাড়ি মেরামতের কারখানা আছে। শহরের বেশিরভাগ মালিক গাড়ি মেরামতের প্রয়োজন পড়লে এখানে দিয়ে যায়। সেখানে খোঁজ নিলে হয়তো বৃদ্ধার বর্ণনাকৃত ট্যাক্সিটার খোঁজ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে নীতিনবাবুকে নামিয়ে দিয়ে চুয়াপুরের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল বিশাল।

— আমরা কোথায় যাচ্ছি?

— ট্যাক্সিটার খোঁজ নিতে হবে।

— আমরা কেন রুমানার পিছনে ছুটছি? নীতিনবাবুর ঝামেলা উনি বুঝবেন। বোম ব্লাস্ট হয়েছে, মানুষ মারা গেছে। অপরাধী খোঁজার দায়িত্ব পুলিশের। আমরা কেন শুধু শুধু হয়রান হব?

— রুমানাকে নিয়ে যথেষ্ট ডাউট আছে আমার। হয়তো সে আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল।

কথায় কথায় চুয়াপুরে এসে গেল ওরা। একদিক থেকে প্রত্যেকটি গ্যারেজে খোঁজ নিতে নিতে গণপতি বাপ্পা গ্যারেজে এসে পৌঁছোল। গ্যারেজ মালিক লছমনপ্রসাদ অবাঙালি। দশাসই চেহারা। ছালার মতো বিশাল বপু একটি গাড়ির বনেটে স্থাপন করে কর্মচারীদের কাজ তদারকি করছে। বিশালকে দেখে জোড়াহাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, ক্যায়া নসিব হামারা! বিশালবাবু আপ হামারা গ্যারেজমে? আইয়ে বাবু, অন্দর আইয়ে।

— ভিতরে গিয়ে কাজ নেই। আপকো কুছ পুছনা থা। ঝুট মাত বলিয়ে।

— দ্যাখো কাণ্ড! ঝুট কাঁহে বুলব। পুছিয়ে ক্যায়া বাত?

— সাদা রঙের একটা অ্যাম্বাসাডার, কাজ কমপ্লিট না করেই কি কেউ গ্যারেজ থেকে নিয়ে গেছে? গতকাল বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায়।

— কাল হামি ইধার আছিলাম না। থোরা ইনতেজার কিজিয়ে, পুছকে বুলছি। অতঃপর লছমনপ্রসাদ গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ল, আলুয়া ইধার আও বাচ্চে।

একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে এগিয়ে এল। পরনে নোংরা প্যান্ট-সার্ট। হাতদুটো তেল-মবিল মাখানো। লছমনপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ওই রকম একটা গাড়ি কেশব নিয়ে গেছে।

— সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার, পিছনের ডিকির ঢাকনা লাগানো হয়নি। বিশাল জিজ্ঞাসা করল।

— হাঁ।

— কেশবের মুখে দাড়ি আছে?

— আছে। বলল একটা কাজ সেরে আবার দিয়ে যাচ্ছি, এখনও আসেনি।

— কেশব কোথায় থাকে?

— স্টেশন রোডে। ওদের গেটের কাছে একটি পলাশ গাছ আছে।

— গুড। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।

একখানা একশো টাকার নোট ছেলেটির হাতে দিল বিশাল। অতঃপর লছমপ্রসাদকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। সোজা এসে উঠল বাংলোয়। লিয়াকত ছিল সেখানে। তার কাছ থেকে জেনে নিল কেউ দেখা করতে এসেছিল কিনা, ফোনটোন এসেছিল কিনা ইত্যাদি। তারপর ঢুকে গেল নিজের চেম্বারে। চারদিন শহরে ছিল না। অনেক কাজ পড়ে আছে। একটু একটু করে সব গুছিয়ে নিতে হবে।

অতঃপর নৈশ অভিযান, অপারেশন কেশব।

স্টেশন চত্বরে পৌছোনোর বেশ খানিকটা আগে, একটি পলাশ গাছ কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইটের দেওয়ালের উপর টিনের ছাউনি দেওয়া ছোটো বাড়িটা। রাস্তার বামদিক ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল বিশাল। চরণ নেমে গিয়ে দরজার কড়া নাড়াল। বার তিনেক আঘাত করার পর আট-দশ বছরের একটি মেয়ে দরজা খুলে ধরল, কাকে চান?

— কেশব আছে বাড়িতে?

— আছে। ডেকে দেব ছোড়দাকে?

— হ্যাঁ। বলো এক বন্ধু দেখা করতে এসেছে। জরুরি দরকার।

— একটু অপেক্ষা করুন। দরজা খোলা রেখেই মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। এই অবসরে চরণ দরজা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল, যাতে কেশব দূর থেকে দেখতে না পায়।

— কে রে, কোথায় গেলি? মুখ-ভরতি দাড়ি-গোঁফ, কাঠ কাঠ চেহারা, পরনে সস্তা দামের রঙিন স্যান্ডো গেঞ্জি, নিম্নাঙ্গে কাটা লুঙ্গি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক

কেশব দরজার এপারে আসতে চরণ চকিতে তার পেটে রিভলবার চেপে ধরল, কোনো কথা নয়। চুপচাপ গিয়ে গাড়িতে উঠে বোস।

ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে যায় কেশব। তাছাড়া চরণকে সে ভালো করে চেনে। এদের বিরোধিতা করলে পরিণাম কী হতে পারে তাও তার জানা আছে। সবদিক বিবেচনা করে যন্ত্রচালিতের মতো নির্দেশ পালন করল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট করা ছিল। চরণ উঠে বসতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল বিশাল।

— তোমার সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। যদি বাধ্য না করো তোমার কেশ স্পর্শ করব না। যেমন তুলে এনেছি, কাজ হয়ে গেলে ঠিক সেভাবেই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। আর যদি...। দ্রুত গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে এনে গির্জা মোড়ে এসে প্রথম কথা বলল বিশাল।

— কী করতে হবে আমাকে। ঢোক গিলে বলল কেশব।

— গতরাতে ট্যাক্সি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

— মাতৃসদনে।

— মিথ্যে কথা বলার ঝুঁকি নিয়ো না কেশব, পরিণাম ভালো হবে না। গতরাতে তুমি একটা মেয়েকে লিফট দিয়েছ। বলো কোথায় রেখে এসেছ তাকে?

— বিশ্বাস করুন বিশালবাবু। আমার এক আত্মীয়ের মেয়ের লেবার পেন উঠেছিল। তাকে নিয়ে মাতৃসদনে গিয়েছিলাম। সে এখনও সেখানে আছে, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

— সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। চরণ।

বিশালের মুখের কথা শেষ হতে না হতে চরণ রিভলবারের বাঁট দিয়ে কেশবের গর্দানে আঘাত করল। — শালা বেশি নখরাবাজি করবি তো সব ক-টা দানা মগজে ঢুকিয়ে দেব।

— আমাকে খুন-খারাপি করতে বাধ্য কোরো না। বলো কোথায় রেখে এসেছ মেয়েটাকে? রাধার ঘাট পেরিয়ে এসে শুনসান মাঠের মাঝে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কেশবের দিকে তাকাল বিশাল।

— আমি কোনো বিপদে পড়ব নাতো?

— আমি দায়িত্ব নিলাম। নিশ্চিন্তে বলো কোথায় রেখে এসেছ মেয়েটিকে।

— মাতৃসদন থেকে ফেরার পথে নতুন বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি একটি মেয়ে প্রাণপণ ছুটছে। কাছাকাছি আসতে সে হাত দেখাল। বিপদে পড়েছে ভেবে তাকে গাড়িতে তুলে নিলাম। থামল কেশব। দম নিয়ে আবারও বলতে থাকল, কী হয়েছে জানতে চাইলে মেয়েটি বলল কয়েকজন বদমাশ ছেলে তার পিছু নিয়েছে।

— তারপর?

— মেয়েটি ড্রিমনাইট বারে নাচে। নাচ শেষে ফেরার পথে বদমায়েশ ছেলেগুলো তার পিছু নিয়েছিল। বোম ব্লাস্টের কথা তখনও আমি জানতাম না।

— কখন জানলে? জিজ্ঞাসা করল চরণ।

— আজ সকালে।

— মেয়েটিকে নিয়ে বাবুলবোনা রোডে তার ভাড়াবাড়িতে গেলে। তারপর কোথায় গিয়েছিলে?

— পলাশি। ছোটো করে উত্তর দিল কেশব।

— গুড! বিশাল দ্রুত গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে ঝড়ের বেগে পলাশির উদ্দেশ্যে ছুট লাগাল।

হাসপাতাল মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে হাফ কিলোমিটার মতো আসার পর, প্লাস্টারবিহীন একটি ইটের বাড়ি দেখিয়ে কেশব বলল, গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটি ওই বাড়িতে ঢুকেছে।

আর এগোল না বিশাল। রাস্তার একপাশে গাড়ি পার্ক করে নেমে দাঁড়াল। চরণও নামতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বিশাল বলল, তুই কেশবকে নিয়ে ভিতরে ওয়েট কর। প্রয়োজনে সংকেত দেব, তখন আসবি।

চরণ সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করে জাঁকিয়ে বসল। বিশাল পকেট থেকে রিভলবার বার করে উলটেপালটে দেখে নিল। তারপর সেটাকে ডানহাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে দু-লাফে গিয়ে পৌঁছোল নির্দিষ্ট বাড়ির দরজায়। কিছুক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর কেউ ফলো করছে না নিশ্চিত হয়ে দরজায় আলতো করে চাপ দিল। দরজা ভিতর থেকে লক করা আছে। সেটাই স্বাভাবিক, রাতের বেলা দরজা খুলে রেখে কেই-ই বা ঘুমোয়।

বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে বিকল্প পথের সন্ধান পেতে হবে। দরজা ছেড়ে সরে এল বিশাল। বাড়ির পিছনদিকে ফুট তিনেকের সরু রাস্তার ওপারে বুক-সমান উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি আমগাছ। বিশাল গাছ বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে লাফ দিয়ে ছাদে পৌঁছোল।

ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে কপাট নেই, চটের বস্তা সেলাই করে পর্দার মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আস্তে করে চটের আড়াল সরিয়ে উঁকি দিল। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়ে মিশেছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

পাশাপাশি দুটো রুম। প্রথম দরজার কপাটে চাপ দিতে পাল্লা সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভিতরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি আটকে দিল। তারপর পিছন ফিরে দাঁড়াল।

নাইটল্যাম্পের মরা আলো গায়ে মেখে একটি মেয়ে শুয়ে আছে— রুমানা। অসাবধানে তার পরনের নাইট গাউনটা পেটের উপর উঠে এসেছে। প্যান্টি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশাল। রুমানার চুলের গোছা ধরে টেনে বসিয়ে বলল, যদি তুমি অপরাধী না হও কোনো ভয় নেই।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যায় রুমানা। সর্বোপরি সামনে বিশালকে দেখে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মুখ দিয়ে ছোটো আর্তনাদ পর্যন্ত নির্গত হল না। তবে তা সাময়িক। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনি। কেন এসেছেন এখানে? কোন সাহসে আমার ঘরে ঢুকেছেন?

বিরক্ত হয় বিশাল। ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, কী করবি আমার? পুলিশে খবর দিবি? চিৎকার করে লোক ডাকবি? ডাক। দেখি কে এসে তোকে বাঁচায়?

রুমানা কোনো কথা বলল না, মাথা নীচু করে বসে থাকল। বিশাল আবারও বলল, বোম ব্লাস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন শহর ছেড়ে চলে এলে?

— ভয়ে।

— ভয়। কীসের ভয়? কে তোমাকে ভয় দেখিয়েছে?

সোজা হয়ে দাঁড়াল বিশাল। তারপর বলল, চুপ করে থেকো না রুমানা।

রুমানা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পরনের পোশাক ঠিক করে নিল। তারপর বলল, প্রাণের ভয় কার না আছে। আমি ভেবেছিলাম ওরা আমাকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছে।

— ওরা করা?

— জানি না ওরা কারা। ক-দিন ধরে লক্ষ করছিলাম ক-জন ছেলে আমাকে ফলো করছে।

— আমাকে বলোনি কেন?

এ-কথার কোনো উত্তর দিল না রুমানা। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

— নীতিনবাবু জানতেন এ-কথা? পুনরায় জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— না। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু...

রুমানা কথা সম্পূর্ণ করতে পারল না। বিশাল পুনরায় তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। — থামো। তখন থেকে একটার পর একটা মিথ্যে বলে যাচ্ছ। তোমার কি মনে হয় আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? এত বড়ো সাম্রাজ্য এমনি এমনি গড়ে উঠেছে? বলো কারা বোম ব্লাস্ট করেছে এবং কেন? আমার বিশ্বাস তুমি সব জানো।

— না। আমি বলতে পারব না।

— বলতে তোমাকে হবেই রুমানা। হারি আপ, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ো না। জানো তো মানুষ খুন করতে আমার হাত কাঁপে না।

— বললে ওরা আমাকে মেরে দেবে।

— না বললে আমি তোমাকে এখনই মেরে ফেলব। রিভলবার তাক করে বলল বিশাল।

— অবিনাশবাবুর লোক।

— অবিনাশের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

— মাস ছয়েকের।

— হুম! আমাকে খুন করার জন্য তোমাকে বহরমপুরে পাঠানো হয়েছিল। বারে নাচা তবে...। এই নীতিনবাবুও কী তোমাদের সঙ্গে জড়িত?

— না। তিনি কিছুই জানেন না।

— না জানলেই তার মঙ্গল। থামল বিশাল। একটু চিন্তা করে নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তোমার দলে আর ক-জন আছে?

— পাঁচজন ছিল। তার মধ্যে একজন বোম ব্লাস্টে মারা পড়েছে।

— সুইপারটাও কি তোমাদের দলে ছিল?

— হ্যাঁ! আপনার গতিবিধি দলের লোককে জানানোর দায়িত্বে ছিল সে।

— সে রাতে আমি বারে যাইনি, এমনকি শহরেও ছিলাম না। তাহলে বোম চার্জ করা হল কেন?

চট করে উত্তর দিল না রুমানা। হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বিশাল তাড়া দিলে মুখ খুলল, আপনি শহরে নেই এই সংবাদ ওদের কাছে ছিল না। আপনার গাড়ির কালারের গাড়ি আসতে দেখে ওরা মনে করেছিল...

থামল রুমানা। বিশালও চট করে কোনো কথা বলল না। ঘর জুড়ে নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। অতঃপর নীরবতা ভঙ্গ করে বিশাল কথা বলল, ওঠো রুমানা। তৈরি হয়ে নাও। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

— কোথায়?

— বহরমপুর।

— আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

— অবিনাশের ছেলেগুলোকে চিনিয়ে দিতে হবে না?

— ওরা কি এখনও সেখানে আছে?

— আলবাত আছে। কাজ শেষ না করে ওরা অবিনাশের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কাম অন, কুইক।

রাতারাতি রুমানাকে নিয়ে বহরমপুরে ফিরে এল বিশাল। আগের ভাড়াবাড়িতেই তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশাল নীতিনবাবুকে বলে দিয়েছে রুমানা যেমন প্রোগ্রাম করছিল তেমনই করবে। তবে সে কার সঙ্গে যোগাযোগ করছে, কোথায় যাচ্ছে, সব খবর পাই টু পাই যেন তাকে জানানো হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লালগোলা ব্যাবসার একটি বড়ো ক্ষেত্র। এলাকার অনেক চাষি পোস্ত চাষ করে। তাদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিশাল। চোরাই পথে তা চলে যায় বিহারের প্রত্যন্ত এলাকার রসায়নাগারে। সেখান থেকে ড্রাগস বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশ- বিদেশে।

ইদানীং পোস্ত চাষকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। সমাজসেবামূলক কিছু প্রতিষ্ঠান পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছে। কখনও পোস্তগাছ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, কখনও চাষিকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় থানার বড়োবাবুর বড়ো ভূমিকা রয়েছে, বলতে গেলে তিনিই এই আন্দোলনের কান্ডারি। চরণ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না লোকটাকে।

— বলতো অফিসারকে গুম করে দিই। বলল চরণ।

— তাড়হুড়ো করার দরকার নেই। ঠান্ডা মাথায় লাভক্ষতির হিসাব কষে এগোতে হবে।

স্থানীয় এমএলএ-কে কল করল বিশাল। রিং হয়ে গেল, কেউ রিসিভ করল না। বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিয়ে বলল, ক-দিন আর ওদিকে না যাওয়াই ভালো।

— ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে ব্যাবসার।

— তা কী আর আমি বুঝছি না। কিন্তু...

— এমন সময় লিয়াকত একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই চরণ লাফিয়ে উঠল, নয়নতারা তুই! কেন এসেছিস এখানে? তোকে না বারণ করেছিলাম এখানে আসতে।

সে রাতে মেয়েটাকে ভালো করে দেখা হয়নি। পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। মাথা তুলে মেয়েটির আপদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল বিশাল। নাতিদীর্ঘ উচ্চতা, রোগাপাতলা গড়ন। খুব সুন্দরী না হলেও চেহারায় চটক আছে। বয়স বিশ-বাইশের ঊর্ধ্বে হবে না। এর মধ্যেই শরীরের বাঁধন আলগা হতে শুরু করেছে। চোখের কোণে কালি, যৌবন স্তম্ভ নিম্নমুখী। পরনে সস্তা দামের একটা কামিজ, তাও জায়গায় জায়গায় ফাটা। পায়ের চটি জোড়ার অবস্থাও তদ্রূপ।

— কেন এসেছ নয়ন? জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— বস্তিতে তিষ্টোতে পারছি না বাবু। কান-কাটা গজু জ্বালিয়ে খেল।

— কে সে?

— ল্যাংচার সহচর। এখন সে-ই গ্যাংলিডার হয়ে বসেছে।

— কী বলছে ও?

— কোর্টে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য চাপাচাপি করছে। কথা না শুনলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

— হুম! ও কি তোমার বাঁধা খদ্দের?

— না বাবু। মাঝে মাঝে আসে, খাই মিটিয়ে চলে যায়।

— ও আবার কবে আসবে তোমার কাছে?

— আজ রাতে আসার কথা আছে।

— তুমি এখন যাও। দেখছি কী করা যায়।

নয়নতারা কোনো কথা না বলে চলে যেতে উদ্যত হলে বিশাল পিছু ডাকল।

— নয়ন শোনো।

— বলেন বাবু। ঘুরে দাঁড়াল নয়নতারা।

পকেট থেকে দু-হাজারের একখানা নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বিশাল বলল, একটা ভালো পোশাক কিনে নিয়ো।

নয়ন এতটা আশা করেনি। আর করবেই বা কোন সূত্রে? শরীর ভোগ না করে কেউ শুকনো হাসিটুকু উপহার দেয় না, সেখানে এতগুলো টাকা না চাইতে দিয়ে দিল। লোকটার মাথা খারাপ নাকি? নোটখানি হতে নিয়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নয়নতারা। অস্বস্তি বোধ করে বিশাল। চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আর কিছু বলার আছে তোমার?

— না মানে! এই টাকা...

— ওতে হবে না বলছ? বিশাল আর-একখানা নোট দিয়ে বলল, এখন এসো নয়ন। আমাদের কাজ আছে।

নয়নতারা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বিশাল পুরোনো কথার সূত্র ধরে চরণকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকল, হ্যাঁ যা বলছিলাম। এমএলএ-কে বলে ওসিকে অন্য কোথাও বদলি করিয়ে নিজেদের কাউকে বসাতে হবে। ততদিন আমাদের কেউ যেন ওদিকে না যায়।

— এমএলএ খুব সুবিধার নয়। ব্যাটা শুধু টাকা চেনে, কথা রাখতে জানে না।

— রাজনীতির কোন লোকটাই বা সুবিধার? সব ব্যাটাই ধড়িবাজ, স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। পাবলিক ওদের...

হঠাৎ মোবাইল ফোনটা আর্তনাদ করে ওঠায় বিশাল কথা শেষ করতে পারল না। পকেট থেকে সেটটা বার করে দ্যাখে রুমানার কল। রিসিভ করে সাড়া দিল বিশাল। রুমানা বলল, চট করে একবার বারে আসুন। জরুরি কথা আছে।

দেরি না করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিশাল। মিনিট কয়েকের মধ্যে বারে পৌঁছে ড্রেসিংরুমে ছুটে গেল। সেখানে নীতিনবাবুকে একা দেখে জিজ্ঞাসা করল, রুমানা কোথায়?

— ওয়াশরুমে। আপনি বসুন। বিশাল বসলে নীতিনবাবু আবারও বললেন, ঠান্ডা-গরম কিছু দেব?

নীতিনবাবুর জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর দিল না বিশাল।

সিগারেট জ্বালিয়ে পরপর ক-টা টান দিল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, পাশের গাঁ থেকে একটি মেয়েকে তুলে এনে দিব্যি মুম্বাইয়া বলে চালাচ্ছেন। ক-দিন চলবে এভাবে?

— হেঁ হেঁ হেঁ! কী আর করব বলুন। মুম্বাইয়ের ডান্সার এনে কি নাচাতে পারব? অত খরচ করার মুরোদ এই শহরের ক-জনেরই বা আছে?

— সেদিন; মানে বোমব্লাস্টের দিন আপনার সত্য কথা বলা উচিত ছিল।

— অজ্ঞাতে ভুলটা করে ফেলেছি। এতটা জিভ বার করে দাঁতে কাটলেন নীতিনবাবু।

— এসপি সাহেব কী বলছেন এই ব্যাপারে? এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে যাবার পরেও রুমানার পরিচয় গোপন করেছেন। আপনিও ব্লাস্টে জড়িত সন্দেহ করতেই পারেন তিনি।

কথা শুনে নীতিনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। খপ করে বিশালের হাত চেপে ধরে বললেন, ছাপোষা গরীব মানুষ আমি। ব্যাবসা করে খাই। আপনি একটু দেখবেন স্যার যেন...

নীতিনবাবু কথা শেষ করার আগেই রুমানা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এল। বিকেলের শুভেচ্ছা জানিয়ে ওদিকের সোফায় বসল। কোনোরকম ভণিতা না করে বিশাল জানতে চাইল, কেন ডেকেছ?

— কথা আছে। মানে বলছিলাম কী...। ইতস্তত করতে থাকে রুমানা। বিশাল বুঝতে পারে নীতিনবাবুর সামনে কথাটা বলতে চাইছে না সে। নীতিনবাবুও হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। চট করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা কথা বলুন। ততক্ষণ আমি...। হেঁ হেঁ হেঁ।

বেরিয়ে গেলেন নীতিনবাবু। রুমানা উঠে গিয়ে দরজার খিল এঁটে দিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে বসতে বসতে বলল, সকালে ইন্দিরা মার্কেটে গিয়েছিলাম কেনাকাটা করতে। ওখানে তাদের একজনকে দেখলাম।

— কী নাম তার?

— আমি তাকে প্রদীপ নামে জানি। বলতে পারব না সেটা তার আসল নাম কি না। লোকটার ডান কান কাটা, বিড়ালের মতো কটা চোখ।

— কী কথা হল ওর সঙ্গে?

— আমি ইচ্ছা করেই কথা বলিনি। একটা পানের গুমটির আড়ালে দাঁড়িয়ে ফলো করছিলাম। কিছুক্ষণ মার্কেটের ভিতর ঘোরাঘুরি করে রিকশো চেপে বেরিয়ে গেল।

আমার মনে হয় সে কারও খোঁজে এসেছিল।

রুমানার কথার উত্তর না দিয়ে বিশাল নিজেকে শুনিয়ে বার কয়েক 'ডান কান কাটা, বিড়ালের মতো কটা চোখ' শব্দগুলো উচ্চারণ করল। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়তে তার মুখমণ্ডল বেয়ে হাসির রেখা খেলে গেল। রুমানা নজর রাখছিল তার উপর। বলল, কী হল বিশালবাবু?

— পেয়েছি। তোমার সেই লোকটাকে খুঁজে পেয়েছি। তুমি ঠিকই বলেছ প্রদীপ তার নাম নয়। ও হল...। এনিওয়ে আর কিছু বলার আছে তোমার?

— গত সন্ধ্যায় থানায় গিয়েছিলাম, ওরা ডেকে পাঠিয়েছিল। কথার কী মারপ্যাঁচ রে বাবা।

— কী রকম?

— বোমব্লাস্ট হতে কেন শহর ছেড়ে পালিয়েছিলাম জানতে চাইল।

— কী বললে তুমি?

— আপনাকে যা বলেছি, ওদেরও তাই বললাম।

— হুম্! তারপর?

— ছেলেগুলোকে দেখলে চিনতে পারব কিনা জানতে চাইলেন এক অফিসার।

— কী উত্তর দিয়েছ?

— পারব বলেছি।

— সত্যি সত্যি যদি পুলিশ টিআই প্যারেড করায়, কী হবে তখন?

— আমি কাউকে চিনব না।

রুমানার কথার পিঠে কথা যোগ করার প্রয়োজন বোধ করল না বিশাল। উঠে দাঁড়াল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লাইফলাইন নার্সিংহোমে যেতে হবে। মা ভরতি আছে সেখানে। গতরাতে হঠাৎ করে ভারতীর শরীর খারাপ করলে নার্সিংহোমে নিয়ে যায় বিশাল। ডা. দেবাঞ্জন রায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর কিছু রিপোর্ট করার সুপারিশ করেছেন। ল্যাব টেকনিশিয়ান তখনই রক্ত নিয়েছে। আজ সকালে মাথার ছবি করার কথা। সব রিপোর্ট একসঙ্গে নিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে।

— গজুর ডান কান কাটা তাই না চরণ? নার্সিংহোমের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— হুঁ! কেন গুরু?

— আজকাল ও অবিনাশবুড়োর হয়ে কাজ করছে।

— বলছ কী!

— ওর সঙ্গে আর-একজন আছে, তাকে শনাক্ত করতে হবে। আমাকে খুন করার সুপারি দিয়েছে অবিনাশ চৌধুরী।

— হুকুম দাও আজ রাতেই গজুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই।

— এই মুহূর্তে খুনখারাপির মধ্যে না যাওয়াই ভালো। ল্যাংচা খুনের ঘটনায় এসপি খাপ্পা হয়ে আছেন। আর-একটা খুন হয়ে গেলে...। বাই দ্য বাই, গজুকে জব্দ করার প্লান আমি ছকে ফেলেছি। সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না।

নার্সিংহোমের গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে তারা ল্যাবে গেল। রসিদ দেখিয়ে রিপোর্ট চাইলে কাউন্টারে বসা একটি ছেলে জানাল ডা. রায়কে রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা আর সেখানে সময় নষ্ট করল না। সোজা দোতলায় উঠে এল। সাত নম্বর কেবিনে আছে ভারতী। দেখভাল করার জন্য দুজন প্রশিক্ষিত নার্স নিযুক্ত করা হয়েছে। পালা করে তারা চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করছে। তাদের একজন বিশালকে দেখে স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, স্যার আপনার মাকে একটু বোঝান। ওষুধ খেতে চাইছেন না। অকারণে আমাদের বকাবকি করছেন।

— প্লিজ সিস্টার বিরক্ত হবেন না। একটু মানিয়ে চলবেন। আসলে মা আমার এরকম বাঁধাধরা নিয়মে অভ্যস্ত নয়। তাছাড়া বয়স হয়েছে, একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। আপনারা ধৈর্যহারা হবেন না প্লিজ।

মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, না না! আমরা কেন ধৈর্য হারাব, এ তো আমাদের ডিউটি স্যার।

এমন সময় একটি ছেলে এসে জানাল ডা. রায় আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। সময় নষ্ট না করে বিশাল ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে পড়ল। শুভসন্ধ্যা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, রিপোর্ট দেখেছেন ডাক্তারবাবু?

মাথা ঝাঁকালেন ডা. রায়। তারপর খুব নরম করে বললেন, রিপোর্ট খুব ভালো নয় বিশালবাবু। আপনার মায়ের ব্রেন টিউমার হয়েছে।

ডাক্তারের কথা শুনে বিশালের শিরদাঁড়া বেয়ে হাই টেনশন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। চট করে তার মুখে কথা জোগাল না। সময় নিয়ে ধাতস্থ হয়ে বলল, এখন উপায় কী ডাক্তারবাবু?

— অপারেশন করাতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে রোগীর শারীরিক কন্ডিশন অত্যন্ত খারাপ। বেশি ধকল নিতে পারবেন না। বরং আর ক-টা দিন তিনি এখানে থাকুন, শরীর ডেভলপ করলে তখন কলকাতা নিয়ে গিয়ে...

— এই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ডিসিশান আপনাকেই নিতে হবে ডাক্তারবাবু।

— আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনার পাশে থাকতে।

— থ্যাংকস! ডা. রায়ের হাত দুটো চেপে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল বিশাল।

সাত নম্বর কেবিনে এসে দেখে ভারতী চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। বিশাল এগিয়ে গিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়াল।

নার্সিংহোম থেকে বাংলোয় ফিরে দ্যাখে টিয়াপাখি, পেঁপে, ব্যাঙ, মাছ, ডাব, ইত্যাদির পসরা সজিয়ে বসে আছে লিয়াকত। বিশাল তার থেকে দু-তিনটে তুলে নিয়ে উলটেপালটে দেখে বলল, গুড জব! বোঝাই যায় না মাটির তৈরি।

— বড্ড বেশি দাম নিল স্যার।

— তা নিক। চরণকে নিয়ে কাজে লেগে পড়ো, আগামীকাল সকাল সকাল মাল ডেলিভারি দিতে হবে।

বিশালের এটা নতুন পলিসি। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে মাটির খেলনার পেট চিরে তার মধ্যে মাল ভরে পুনরায় রং করে ডেলিভারি দেওয়া শুরু করেছে। এ জন্য তিনজন নতুন ছেলে রিক্রুট করা হয়েছে। তারা এলাকার পরিচিত ফেরিওয়ালা। কেউ প্রসাধন সামগ্রী ফেরি করে, কেউ-বা শাড়ি-কাপড়। বেশি রোজগার পেয়ে এখন তারা বিশালের হয়ে মাটির খেলনা ফেরি করছে।

লিয়াকতকে নির্দেশ দিয়ে বিশাল বাথরুমে গিয়ে দেয়ালের গোপন কুঠুরি থেকে একটা ছোটো শিশি ও ইনজেকশন সিরিঞ্জ বের করে আনল। আমেরিকার ডা. স্যামুয়েল এই ড্রাগসটির আবিষ্কারক। তাঁর নামেই ড্রাগসের নাম রাখা হয়েছে। এই ড্রাগসের বিষক্রিয়া মারাত্মক, মাত্র টু এমএল-এর ডোজ শক্তসামর্থ একটা মানুষকে বারোঘণ্টা নেশায় বুঁদ করে রাখতে পারে। আর যদি ফাইভ এমএল কোনো মানুষের শরীরে ইনজেক্ট করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ব্লক হয়ে গিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। বরাত জোরে বেঁচে গেলে তার মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাবে, জিভ অসাড় হয়ে গিয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, চোখের নার্ভ নষ্ট হয়ে গিয়ে অন্ধত্ব ডেকে আনবে।

রাত তখন সাড়ে বারোটা। বিশাল মদ আর গ্লাস নিয়ে বসল। বড়ো কোনো অপারেশনে বের হবার আগে হালকা ড্রিংক করা তার অভ্যেস। নেশায় থাকলে টেনশন কম হয়, বিবেক দংশন করে না। মানুষ খুন করেও দিব্যি ঝরঝরে থাকা যায়।

তিন-চার পেগ গলায় ঢেলে নিয়ে চরণকে সঙ্গী করে বাইকে উঠে বসল। নয়নতারার বাড়ি চেনা আছে। একটানে সেখানে পৌঁছে গেল তারা। পূর্ব

পরিকল্পনামাফিক দরজা খোলা রয়েছে। আলতো চাপ দিতে একদিকের পাল্লা সরে গেল। চরণ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল, বিশাল বিড়ালের মতো সাবধানে পা ফেলে ভিতরে প্রবেশ করল। তার একহাতে লোডেড রিভলবার, অন্য হাতে ডা. স্যামুয়েলের ড্রাগস ভরতি ফাইভ এমএল-এর ইনজেকশন সিরিঞ্জ।

ঘরময় জমাট অন্ধকার। ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। নয়নতারার ঘরে থাকার কথা, তার সঙ্গে সেরকম কথা হয়ে আছে। তাছাড়া সে না থাকলে বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝোলানো থাকত। এখন দেখার বিষয় গজু এসেছে কিনা? বিশাল একবার ভাবল নয়নের নাম ধরে ডাকবে। পরক্ষণে ভাবল তাতে করে গজু এসে থাকলে সাবধান হবার সুযোগ পেয়ে যাবে। তার চেয়ে একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক!

কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে। বিশালেরও ফল পেতে দেরি হল না। নয়নের চাপা কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল, গজু এবার ছাড়। শালা আমি মানুষ না যন্তর, তখন থেকে কোলাব্যাঙের মতো পেটের উপরে উঠে বসে আছিস। কষ্ট হয় না আমার। ওঠ ওঠ।

— পারবি না কেন রে শালী? ল্যাংচার বেলায় তো না করতিস না।

— আঃ! ছটফট করে উঠল নয়নতারা।

ততক্ষণে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে। আবছা হলেও দেখা যায় ডানদিকে ছোটো তক্তপোশের উপর নয়নতারা চিত হয়ে শুয়ে আছে, আর তার বুকের ওপর একজন পুরুষ। দুজনের পরনে জন্মলগ্নের পোশাক। বিশাল খুব সন্তর্পণে পা ফেলে তক্তপোশের কাছে পৌঁছে সিরিঞ্জের ছুঁচ সজোরে গেঁথে দিল গজুর পাছায়। ছোটো একটা আর্তনাদ করে গজুর অসাড় দেহটা উলটে নীচে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল তার বুকে পা রেখে রিভলবার তাক করে ধরল।

নয়নতারা ঝড়ের বেগে উঠে দাঁড়িয়ে একখণ্ড কাপড় টেনে নিয়ে নিজের শরীর আবৃত করল। ততক্ষণে চরণ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দুজনে মিলে গজুর অচৈতন্য দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ধরিত্রীর বুকে কালি ছিটিয়ে রাত নেমেছে অনেকক্ষণ। বিশাল চেম্বারে বসে টিভিতে নিউজ শুনছে। এমন সময় স্মার্ট ফোন চিৎকার করে উঠল। ঝুমার কল। রিমোটের সাহায্যে টিভির ভলিউম লো করে দিয়ে কল রিসিভ করল।

— বলো ঝুমা।

— তুমি একবার নার্সিংহোমে এসো। মা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

— মায়ের শরীর ঠিক আছে তো?

— ভালোই তো মনে হচ্ছে। আসলে উনি তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা শেয়ার করতে চান।

— গোপন কথা! স্বগতোক্তি করে মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল বিশাল। তারপর বলল, ঠিক আছে আমি আসছি।

ঝুমার মাসিমাকে বাঁচানো যায়নি। ডাক্তারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন তিনি। খবর পেয়ে বিশাল বরানগর গিয়েছিল। ঝুমাকে নিয়ে ফিরেছে গতকাল। সেই থেকে ঝুমা শাশুড়ির কাছে পড়ে আছে।

ফোন কেটে দিয়ে টিভি বন্ধ করে দিল বিশাল। তারপর চরণকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বাংলো থেকে নার্সিংহোমের দূরত্ব খুব বেশি নয়। হেঁটে গেলে দশ-পনেরো মিনিট সময় লাগে। কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। সেখানে বিশালের খ্যাতি-কুখ্যাতি দুটোই আছে। আছে শত্রুর ভয়, বিশেষ করে অবিনাশ চৌধুরীর প্রেরিত ঘাতক দল কোথায় লুকিয়ে থাকে বলা যায় না। সে জন্য রাতের বেলা বেরোতে হলে আটঘাট বেঁধেই পথে নামে।

ঝুমা শাশুড়ির মাথার কাছে বসেছিল। বিশালকে দেখে উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীর ছেড়ে যাওয়া সিটে বসে মায়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বলল বিশাল, কেমন আছ মা?

— ভালোই তো!

— ঝুমা বলছিল তুমি কী যেন বলবে আমাকে?

— হ্যাঁ রে খোকা, একটা বোঝা সেই কোন কাল থেকে বয়ে বেড়াচ্ছি। আজ-কাল করে তোকে বলা হয়ে ওঠেনি। থামল ভারতী। দম নিয়ে পুনরায় বলল, আসলে কথাগুলো তোকে বলার সাহস হয়নি। পাছে তুই আমাকে ঘৃণা করিস, ছেড়ে চলে যাস এই ভয়ে।

— কী যে বলো মা! তোমাকে ছেড়ে যাবার সাহস আমার আছে?

— তবু আমার ভয় করে। কথা দে সব কথা শোনার পর তুই....

— মা মা, আমার সোনা মা! শুধু কথা কেন, তোমার জন্য বিষ গিলতেও আমার ভয় নেই। সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছেড়ে ফেলে কী বলতে চাও মন খুলে বলো।

— তোর বাবার ব্যাপারে এতদিন আমি কিছু বলিনি। সন্তানের কাছে তার পিতৃপরিচয় অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়, অথচ আমি তোর কাছে এতদিন তা গোপন রেখেছি। পারলে এই অভাগী, কলঙ্কিনীকে ক্ষমা করে দিস খোকা।

— কী সব উলটোপালটা কথা বলছ মা। আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি। একটা কথা শুনে রাখ মা, আমি শুধু তোমাকেই জানি। তুমিই আমার মা, তুমিই আমার বাবা। সন্তানের জন্ম দিয়ে যে গা-ঢাকা দেয়, সেই কাপুরুষের কথা শুনে আমার কাজ নেই।

— তবুও জেনে রাখা ভালো খোকা। তার নাম কৈলাসপ্রসাদ রায়। বর্ধমান জেলার কোনো এক গ্রামে তার বাড়ি।

ভারতী এক এক করে তার ফেলে আসা দিনের সকল কথা শোনাল। বিশাল বলল, মা এতদিন এ নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন করিনি তুমি কষ্ট পাবে ভেবে। কিন্তু আজ যখন তুমি নিজেই সব কথা বললে, কৈলাসপ্রসাদকে আমি ঠিক খুঁজে বার করব। আমার মায়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মাশুল তাকে দিতেই হবে।

— বাবার খোঁজ নিবি, আমি বাধা দেব না। কিন্তু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবি না তুই।

— এ কী কথা বলছ মা? যে লোকটা তোমার জীবন ছারখার করে দিয়েছে তুমি তার...

— আমাকে ভুল বুঝিস না খোকা। আমি ওই শয়তানের হয়ে ওকালতি করছি না। আমার খোকা খারাপ কোনো কাজ করুক, লোকে তাকে মন্দ বলুক, আমি তা চাই না। কথা দে তুই শুধু নিজের অধিকার চাইবি, কোনো ঝামেলায় যাবি না।

— কিন্তু মা, সে যদি অস্বীকার করে?

— করুক। তাতে কি তোর চলবে না? আমি কি তোকে যোগ্য করে তুলিনি?

বিশাল মায়ের হাত দু-খানা নিজের গালে চেপে ধরে বলল, তাই হবে মা। আমি তার কোনো ক্ষতি করব না। কিন্তু...

— কী?

— মানসিক যন্ত্রণা কতটা বেদনাদায়ক তাকে তা টের পাইয়ে ছাড়ব। না মা না, তুমি বারণ করলেও আমি শুনব না। কালপ্রিটটাকে তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

— খোকা শোন। বউ ওকে বলো যেন কোনো হঠকারিতা না করে। চরণ ওকে থামাও।

কারও কথায় কর্ণপাত করল না বিশাল। গটগট করে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

এই ঘটনার ঠিক তিন দিনের মাথায় ঝুমা আর-একবার ফোন করে। সেদিন সে শাশুড়ির মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছিল। এমন দুঃসংবাদ শোনার জন্য বিশাল মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ডা. রায় পর্যন্ত হতবাক হয়ে গেছেন ঘটনার অভিঘাতে।

ঝুমার কথায়, তারা বসে গল্প করছিল। এমন সময় তার ফোনে একটি কল আসে। কল রিসিভ করলে ও-প্রান্তের পুরুষকণ্ঠ ভারতীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ঝুমা শাশুড়িকে ফোন দেয়। কী জানি কী বলেছিল লোকটা, কথা বলতে বলতে ভারতী বুক চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল। ওই অবস্থাতে এক হাতে শাশুড়িকে ধরে রেখে অন্য হাতে মোবাইলটা কানে ধরে ঝুমা। সে শুধু একটা বাক্য শুনতে পায়, "বিশ্বাস করুন, আমি একবর্ণ মিথ্যে কথা বলছি না।" তারপরেই ফোনটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

সব শুনে বিশাল বলল, মা মরেনি। তাকে খুন করা হয়েছে। সে যে-ই হোক, আমি ঠিক খুঁজে বার করব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্মশানকর্ম সমাধা করে ফিরল তখন প্রায় রাত বারোটা। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। দরজার পাল্লা ভাঙা। ভিতরে জমাট অন্ধকার।

— কলি। কলি। এই কলি।

কাজের মেয়ের নাম ধরে বারবার ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। পকেট থেকে রিভলবার বার করে ডানহাতে চেপে ধরল বিশাল। অতঃপর ঝুমার একটা হাত ধরে খুব সন্তর্পণে ফ্ল্যাটের ভিতরে পা রাখল। দরজার ডান দিকে ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পটাপট সবগুলো সুইচ অন করে দিল।

ফ্ল্যাটের ভিতরে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কোনো আসবাব আস্ত নেই। আলমারি-আলনা মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফ্রিজটাকে চেনা যায় না। সিলিং ফ্যানের ব্লেডগুলো দোমড়ানো-মোচড়ানো। এক এক করে সব ঘর ঘুরে দেখল বিশাল। দুষ্কৃতীরা সব জায়গায় সমানে তাণ্ডব চালিয়েছে। এমনকি রান্নাঘরের হাঁড়িপাতিল পর্যন্ত রেহাই পায়নি। সে না হয় নতুন করা যাবে। কিন্তু কলি কোথায়?

বিশাল পাগলের মতো এঘর-ওঘর ছুটোছুটি করতে লাগল। ঝুমা দৌড়ে গেল বাথরুমে। পর মুহূর্তে তাকে চিৎকার করে উঠতে শুনে বিশাল বাথরুমের দরজায় গিয়ে পৌঁছোল। বাথরুমের মেঝেয় চিত হয়ে পরে আছে কলি। শরীরে এতটুকু সুতোর স্পর্শ নেই। চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ঝুমাকে বলল, ওকে ঢেকে দাও।

কলির পোশাক এককোণে পড়ে আছে। ঝুমা সেটা তুলে নিয়ে কলির নগ্নদেহের উপর বিছিয়ে দিল। বিশাল ততক্ষণে এক মগ জল নিয়ে এসেছে। বার দুয়েক চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে নড়ে উঠল কলি। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকিয়ে সামনে কর্তা-গিন্নিকে দেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল কলি।

— কাঁদিস না কলি। উঠে বোস। বলল ঝুমা।

কলি উঠতে গিয়ে পুনরায় শুয়ে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে বলল, পারছি না বউদি। তলপেটে খুব ব্যথা।

বিশাল এগিয়ে গিয়ে কলির দু-বাহু ধরে টেনে তুলল। ঝুমা তাড়াতাড়ি নাইটিটা গলিয়ে দিল তার শরীরে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী মিলে তাকে পাঁজাকোলা করে বেডরুমে

নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল।

— কারা এসেছিল রে? জিজ্ঞাসা করল বিশাল।

— চিনি না, আগে কোনোদিন দেখিনি ওদের। থামল কলি। দম নিয়ে পুনরায় বলল, পাঁচজন এসেছিল। সবার হাতে বন্দুক ছিল। আপনার নাম ধরে ডাকছিল আর গালাগাল দিচ্ছিল।

— ওরা ভিতরে ঢুকল কীভাবে? দরজা বন্ধ ছিল না?

— ছিল দাদাবাবু। পিসিমণির জন্য মন খারাপ করছিল। দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলাম।

— তারপর?

— কলিং বেলের শব্দ পেয়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনারা ফিরেছেন। কিন্তু...। অপরিচিত লোক দেখে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে গেলাম। পারলাম না, ওরা হুড়মুড় করে ভিতরে চলে এল। তারপর আপনাকে না পেয়ে ঘরের সব আসবাবপত্র ভেঙে ফেলল। শেষে আমাকে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে...।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দু-দুটো বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা বিশালকে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে। ঝুলে পড়েছে তার উন্নত গ্রীবা। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার করাল থাবা স্পষ্ট। স্বামীকে এতটা বিপর্যস্ত হতে কোনোদিন দেখেনি ঝুমা। অনুভব করে এই মুহূর্তে তার পাশে একজন সুহৃদ বন্ধু, কাঁধে একটি শক্ত হাত থাকা প্রয়োজন। আর তার থেকে ভালো সুহৃদ আছেই বা কে?

— ভেঙে পড়লে হবে না বিশাল। ঘটনা-দুর্ঘটনার সমন্বয়ে জীবন, কখনও সুসময় আসবে কখনও দুঃসময়। শক্ত হাতে সবকিছুর মোকাবিলা করতে হবে। বাংলোয় চলো, আলোচনা করে আগামী কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বলল ঝুমা। বিশাল কিছু বলল না। চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসে ইঞ্জিন চালু করল।

চরণ-লিয়াকতরা তখনও ঘুমোয়নি। গাড়ি শব্দ পেয়ে বিছানা থেকে উঠে এসে দরজা খুলে চরণ অবাক হল, তোমরা এইসময় এখানে! কী ব্যাপার?

— কথা আছে ভিতরে আয়। বিশাল গটগট করে এসে নিজের চেম্বারে ঢুকল। চেয়ারে বসতে বসতে পুনরায় বলল, কারা আমার ফ্ল্যাটে হামলা করেছিল। আমাকে না পেয়ে বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়েছে। শুয়োরের বাচ্চারা কলিকে পর্যন্ত রেয়াত করেনি। ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে পাঁচজনে মিলে রেপ করেছে।

— চরণ ওরা কার লোক হতে পারে? জিজ্ঞাসা করল ঝুমা।

চরণকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বিশাল বলল, অবিনাশের লোক না হয়ে যায় না। নিঃসন্দেহে আমাকে খুন করতে এসেছিল ওরা।

— শালা ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছে। মন্তব্য করল চরণ।

লিয়াকত বলল, স্যার আমাদের আর চুপ থাকা ঠিক হবে না। হুকুম করুন সব ক-টাকে খুঁজে বের করে ছাগলের মতো জবাই করি।

— ঠিক বলেছ। ঢিলের বদলা পাটকেল ছুড়ে দিতে হবে। কিন্তু কারা এসেছিল ফ্ল্যাটে কী করে বুঝব? বলল ঝুমা।

ঝুমার জিজ্ঞাসার উত্তরে চরণ বলল, আমি আগেই বলেছিলাম শত্রুর শেষ রাখতে নেই। বুড়োটাকে সেদিন একটা দানা খাইয়ে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যেত। কে জানে শালা কাকে আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে।

— এই শহরের কারা আমাদের বিরুদ্ধে নাম লিখিয়েছে খুঁজে বার করতে হবে। চারদিকে লোক লাগিয়ে দাও, এক সপ্তাহের মধ্যে ওদের ধরা চাই। চরণ তোমাকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। পুনরায় বলল ঝুমা।

— আমি! না মানে বলছিলাম এত লোকের মাঝে কোথায় খুঁজব ওদের?

—বাজার-হাট, অফিস-আদালত, মন্দির-মসজিদ-গির্জা সব জায়গায় খোঁজ নাও। এক-একটাকে ধরো আর...

বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারল না ঝুমা। বিশাল ওদের চুপ করতে বলে স্মার্টফোন বার করে নম্বর মিলিয়ে কল বোতামে চাপ দিল।

— রুমানা কোথায়? নীতিনবাবু ওপার থেকে 'হ্যালো' করতেই জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিল বিশাল।

— ওতো এখন পারফর্ম করছে। কী ব্যাপার বিশালবাবু?

— ওকে যেতে দেবেন না, আমি আসছি।

নীতিনবাবু কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। বিশাল তার কথায় কান না দিয়ে ফোন কেটে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ফোনটা প্যান্টের পকেটে রেখে বলল, লিয়াকত বউদি থাকছে এখানে। কেউ বিরক্ত করতে এলে কোনো কথা হবে না, শুট করে দেবে। চরণ আয় আমার সঙ্গে।

— আজ আর কোথাও যেতে হবে না। বিকেল থেকে অনেক ধকল গেছে, একটু ঘুমিয়ে নাও। সকালে দেখা যাবে এদিকটা। বলল ঝুমা।

— ডোন্ট ওরি! যাব আর আসব। টেবিলের উপর থেকে গাড়ির চাবিটা তুলে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে ধাবিত হল বিশাল।

চরণ বসেই থাকল। বিশাল গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে হেঁটে গিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকল। ছুটে এলেন নীতিনবাবু।

— আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শো শেষ হয়ে যাবে। আপনি বসুন, রুমানা ড্রেস চেঞ্জ করতে এখানেই আসবে।

শো শেষ করে রুমানা এল। পরনে নাচের পোশাক। ঘেমেনেয়ে একসা অবস্থা তার। বিশালকে দেখে মুখ টিপে হাসল, সেই মুক্তো-ছড়ানো হাসি। এই হাসি বিশালের শরীর-মনে অন্যরকম অনুভূতির সঞ্চার করে। আজ কিন্তু মোটেই ভালো লাগল না। বরং কিছুটা বিরক্তবোধ করল।

— এসে গেছেন! আমি জানতাম আপনি আসবেন। পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে অপরদিকের সোফায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ল রুমানা।

বিশাল আধপোড়া সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। — বাট হাউ?

— আপনার বাড়িতে হামলা হয়েছে।

— তুমি কীভাবে জানলে?

— আমিই তো ওদের ওখানে পাঠিয়েছি।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না বিশাল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রুমানার টুঁটি চেপে ধরল।

— ইউ ব্লাডি বিচ! বাড়িতে থাকলে আজ আমি খুন হয়ে যেতাম। কেন এ কাজ করলে তুমি?

— প্লিজ বিশালবাবু ছাড়ুন। মরে যাব যে।

— হারামজাদি তোর মরে যাওয়াই ভালো।

— আমাকে বলতে দিন। কেন এই কাজ করতে হয়েছে আমাকে, শুনুন প্লিজ।

— একটা কথাও যদি মিথ্যা বলার চেষ্টা করো...। রুমানাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল বিশাল।

রুমানা একটা লম্বা শ্বাস টেনে বুক ভরাল। অতঃপর ফোঁস করে খানিকটা বাতাস বার করে দিয়ে গলায় হাত বোলাতে বোলাতে স্বগতোক্তি করল, হাত নয় যেন সাঁড়াশি।

— চুপ করে আছ কেন? বলো কেন ওদের পাঠিয়েছিলে?

— আমার উপায় ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি চাই না আপনার কোনো ক্ষতি হোক।

— হঠাৎ এত দরদ!

— আপনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। হয়তো ওরা বাড়িতে ভাঙচুর করেছে, সম্পত্তি নষ্ট করেছে। আপনার জীবনের থেকে নিশ্চয় তা বেশি মূল্যবান নয়! থামল রুমানা। কী ভেবে দরজার কাছে গেল। দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পুনরায় দরজা লক করে দিল। তারপর পূর্বস্থানে ফিরে এসে বলল, আপনাকে মারতে চাইলে আজ কেন ওদের পাঠাব, যখন আমি জানি আপনি ওই সময় শ্মশানে থাকবেন।

— কী বোঝাতে চাইছ তুমি?

— বসিরের ধারণা...

— জাস্ট আ মিনিট! কোন বসির? জলঙ্গীর বসির কি?

— ওটা তার প্রকৃত নাম কিনা তাও জানি না। লোকটির বাঁ চোখ কানা।

— ঠিক। কলেজ ক্যান্টিনে ছাত্রদের ড্রাগস সাপ্লাই করতে গেলে ছেলেদের মারে ওর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

— সেও অবিনাশবাবুর দলে আছে। আপনাকে মারার জন্য ক-দিন থেকে সে ফাঁক খুঁজছিল। প্রেসার দিচ্ছিল আপনার গতিবিধি জেনে যেন ইনফর্ম করি।

— তারপর!

— ইদানীং সে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করেছে। এমনকি অবিনাশবাবুকেও সে বলেছে আপনার সঙ্গে আমার সমঝোতা হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে আপনার অনুপস্থিতিতে ওদের...

— এসেছিলে আমাকে মারতে, এখন বাঁচাতে চাইছ?

— যে কারণে এতদিন বসিরের সঙ্গ দিয়েছি, একই কারণে আপনার সঙ্গ চাইছি। প্লিজ বিশালবাবু হেল্প মি। আমি জানি আপনি পাশে না দাঁড়ালে আমার লক্ষ্যপূরণ হবে না।

হঠাৎ করে রুমানা বিশালের হাত চেপে ধরল। ঠিক তখনই খুট করে দরজার লক খোলার শব্দ হল। তড়িৎ গতিতে রুমানাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাল। চকিতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে দরজার দিকে তাক করে ধরল। রুমানা উঠে গিয়ে দরজার আইহোলে চোখ রেখে বাইরে নজর দিল। তারপর দরজা খুলে দিয়ে বলল, এসো।

রুমবয় দু-কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। বিশাল তখনও অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেশুনে ছেলেটির ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। কী করবে ভেবে না পেয়ে একবার বিশালের দিকে তাকায় একবার রুমানার দিকে। রুমানা তাকে টেবিলে কাপ রেখে দিয়ে চলে যেতে বলল। তাই করল সে।

ছেলেটা বেরিয়ে যেতে বিশাল পুনরায় দরজা লক করে দিল। তারপর রিভলবারখানা কোমরে গুঁজে পূর্বস্থানে ফিরে বসতে বসতে বলল, ক্রমশ তোমার চরিত্র দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আমাকে মারতে এসে এখন আমারই সাহায্য চাইছ। হোয়াটস দ্য ম্যাটার? হেঁয়ালি না রেখে পরিষ্কার করে কাশো দেখি।

রুমানা একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, আজ থেকে দু-বছর আগে বেলডাঙা থানার এক অফিসার খুন হন। আশা করি আপনার জানা আছে। শয়তানরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আমি তার বদলা চাই।

— অফিসারের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

— তিনি আমার দাদা। আমি তখন কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশোনা করছি। দাদার মৃত্যুতে আমাদের পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল আমার পড়াশোনা।

— তারপর?

— জানি না অবিনাশবাবু কীভাবে আমাকে চিনতেন। একদিন এক মহিলা এসে জানায় তার বস জানে দাদাকে কে খুন করেছে। সেই আমাকে নিয়ে যায় অবিনাশবাবুর কলকাতার ডেরায়। তার কাছ থেকে জানতে পারি বিশাল নামে বহরমপুরের এক মাস্তান দাদার খুনি, যে কিনা ড্রাগসের কারবার করে।

— তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে খুন করার আশায় বেছে নিলে এই পঙ্কিল জীবন? ভেরি স্যাড।

রুমানা কোনো কথা বলল না। মাথ নীচু করে চায়ের কাপটা নাড়াচাড়া করতে থাকল। বিশাল আবারও বলল, তোমাকে মিথ্যা গল্প শুনিয়েছে স্কাউন্ড্রেলটা। ব্যাবসার খাতিরে দু-চারটে খুনের ঘটনায় জড়াতে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনো পুলিশ অফিসারকে হত্যা, না এখনও পর্যন্ত আমি তা করিনি।

— কান কাটা লোকটার খোঁজ দেবার আগে পর্যন্ত জানতাম আপনিই দাদার খুনি। মুখে সহায়তা করার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে আপনাকে খুন করার সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলাম। দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল। বারের ভিতরেই পটাসিয়াম সায়ানাইড ইনজেক্ট করে...

— ভেরি ইনটারেস্টিং। তারপর কী হল?

— দু-এক দিনের মধ্যে আপনাকে আমার পারফরমেন্স দেখার জন্য ইনভাইট করার কথা ছিল। সেখানেই বসির কৌশলে...।

— ডাকলে না কেন?

— তার আগে একটা ফোন কল এসে সব হিসাব ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

— কলটা অবিনাশ চৌধুরীর ছিল তাইতো?

— হুম্।

— কী বলেছিল বুড়ো?

— সেদিন হোটেল হোয়াইট হাউসে বসিরের সঙ্গে সিটিং ছিল। আলোচনার ফাঁকে একসময় বসির উঠে বাথরুমে গেল। ঠিক তখনই তার মোবাইলে কলটা আসে। আমি কল রিসিভ করতে ওপার থেকে অবিনাশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, অশ্বিনী নামে যে পুলিশ অফিসারকে তুমি খুন করেছ, রুমানা তার বোন। সাবধান সে যেন জানতে না পারে তুমিই তার দাদার খুনি। আমি কৌশলে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি খুন করেছে বিশাল। তুমিও তাকে সেই কথা বলবে।

— ইজ ইট।

— ইয়েস। আমি একবর্ণ মিথ্যে বলছি না বিশালবাবু। বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা।

— হুম! তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছ? থামল বিশাল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বার দুই চক্কর দিয়ে ফিরে এসে পুনরায় সোফায় বসে বলল, বেশ। বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। এখন বলো আমাকে কী করতে হবে?

— বসিরকে কবজা করে আমার হাতে তুলে দেবেন। আমি নিজের হাতে শয়তানটাকে মারতে চাই। বলতে বলতে রুমানার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

— আফটার অল, আই অ্যাম আ বিজনেস ম্যান। যে কোনো ডিল সম্পন্ন করার আগে লাভের দিকটা খতিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। বসিরের বিনিময়ে আমি তোমার কাছ থেকে কী পাব?

বিশালের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আস্তে করে বলল, আপনি যা চাইবেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

লিয়াকতের মুখে সংবাদ শুনে স্প্রিং লাগানো পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠল বিশাল।
— তুমি ঠিক বলছ লিয়াকত! আমি যে কৈলাসপ্রসাদকে খুঁজছি ইনিই সেই ব্যক্তি?

— জি স্যার। আমি তাঁর ঠিকুজি-কুষ্ঠি ছকে এনেছি। এই দেখুন। লিয়াকত পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে বসের হাতে দিল। ভাঁজ খুলে মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকল বিশাল।

শ্রীকৈলাসপ্রসাদ রায়। আদি নিবাস বর্ধমান জেলার পটাশডাঙা গ্রাম। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বিএ ক্লাসে ভরতি হয়েছিলেন। সিনহা লজে থাকতেন। ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে অজ্ঞাত কারণে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যান। গ্রামের লোকের ধারণা নারীঘটিত কেলেংকারিতে ফেঁসে থাকবে হয়তো। এই দোষ তার বরাবরের, গ্রামেও বার দু-এক ফেঁসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। বর্তমানে উধমপুর স্পিনিং মিলের মালিক। এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। বছর দুয়েক আগে ওর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। ছেলে বিদেশপ্রসাদ রায় আমেরিকা থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে এসে ব্যাবসার হাল ধরেছে। চরিত্রবান ও উন্নত মানসিকতার ছেলে সে।

মেয়ের নাম বিদিশা। কলেজ পড়ুয়া। পলাশ নামে একটি ছেলের সঙ্গে তার অ্যাফেয়ার চলছে। ছেলেটি গরিব ঘরের, কিন্তু ট্যালেন্টেড। বিদিশাকে সে টিউশানি

পড়ায়। মেয়ের এই প্রেমঘটিত সম্পর্ক কৈলাসবাবুর পছন্দ নয়। পক্ষান্তরে বিদেশ বোনের পক্ষে। এই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় চলছে মন কষাকষি।

সেই রাতেই চরণকে সঙ্গী করে উধমপুরে গিয়েছিল বিশাল। কৈলাসবাবু পিতৃত্ব স্বীকার করেননি। বিশালও সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। লিয়াকতকে উধমপুর পাঠিয়েছে। যে করে হোক স্পিনিং মিলের শ্রমিক-লিডারকে ম্যানেজ করা চাই। কৈলাসপ্রসাদের বরবাদির শুরু মিল থেকেই শুরু করতে বদ্ধপরিকর সে।

দু-দিন বাদে লিয়াকতের ফোন পেল বিশাল। শ্রমিক-লিডার বেণীবাবু সদরে এসেছেন।

— বহরমপুরের কোথায়?

— ডক্টর কিরীটি হাজরার কাছে। ওঁর ছেলে খুব অসুস্থ।

— গুড! বেণীবাবুকে আমি এখানেই আটকাচ্ছি। তুমি পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করো। ফোন কেটে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলবার বার করে কোমরে গুঁজে রাখল। তারপর চরণকে ডেকে নিয়ে দ্রুত পায়ে গাড়ির দিকে ধাবিত হল।

নতুন হাসপাতালের সরকারি আবাসনে ডা. হাজরার চেম্বার। নামকরা শিশু-বিশেষজ্ঞ তিনি। চেম্বারের বাইরে বারান্দায় অনেকে বসে আছেন। বেশিরভাগ বাচ্চা কোলে মহিলা। কেউ বুকের দুধপান করাচ্ছে, কেউবা ক্রন্দনরত শিশুকে চিপস-চকোলেট দিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা করছে। বিশাল তাদের গুরুত্ব দিল না। তার দরকার একজন পুরুষ মানুষকে, যার নাম বেণীমাধব পাল।

— আপনাদের মধ্যে বেণীবাবু কে আছেন? উমধপুর স্পিনিং মিলে কাজ করেন।

লাস্ট বেঞ্চের ডানদিকে বসে একটি লোক খবরের কাগজ পড়ছেন। পাশেই সাত-আট বছরের একটি ছেলে বসে বসে ভাজা বাদাম চিবোচ্ছে। লোকটি মুখ থেকে কাগজের পর্দা সরিয়ে বললেন, ইয়েস আমি বেণীমাধব পাল। কেন বলুন তো?

বিশাল তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আপনার ছেলে অসুস্থ শুনে ছুটে এলাম। এই বুঝি আপনার ছেলে? চরণ খোকাকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যা। বল আমার পেসেন্ট, তাড়াতাড়ি দেখে দেন যেন।

— আপনারা কারা?

— বেশি কথা বলা ভালো নয় বেণীবাবু। এত রুগী, আপনার ছেলের চেকআপ করাতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। ভালো হয় না কি যদি আমি তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই? কইরে চরণ খোকাকে ভিতরে নিয়ে যা।

বিশাল বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। মিনিট সাতেকের মধ্যে বেরিয়ে এল সবাই। চরণের একহাতে ধরা বেণীবাবুর ছেলে, অন্য হাতে প্রেসক্রিপশন। বেণীবাবুকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে বলল বিশাল।

— আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

— বেণীবাবু একদম ঘাবড়াবেন না। আপনার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আপনার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছাও আমার নেই, যদি না আপনি আমার অবাধ্য হন।

— কী করতে হবে আমাকে?

— আপনার মনিব শ্রীকৈলাসপ্রসাদ রায় আমার নিকটাত্মীয়। তাঁর সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন চাই।

— উনি মালিক, আমি সামান্য কর্মচারী। তাঁর সম্পর্কে কতটুকুই-বা জানা সম্ভব আমার পক্ষে।

— বোনাস দেওয়াকে কেন্দ্র করে উধমপুর স্পিনিং মিলে শ্রমিক-মালিক ক্যাচাল চলছে, এরকম একটা সংবাদ আমার কানে এসেছে। বিষয়টি বিস্তারিত বলুন শুনি। বিশাল বলল।

— আপনি এ কথা জানতে চাইছেন কেন?

— প্রশ্ন করবেন না বেণীবাবু। যা জানতে চাইছি সোজাসুজি উত্তর দিন। তাতেই আপনার মঙ্গল।

— আমাদের দাবি দু-মাসের মাইনের সমপরিমাণ বোনাস, কোম্পানি বলছে একমাসের দেবে।

— শ্রমিক নেতা হিসাবে আপনি কী চান?

— দশদিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ইউনিয়নের মিটিং।

বাংলোর সামনে চলে এসেছে ওরা। বিশাল আর চরণ প্রায় একসঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। বেণীবাবু ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপটি করে বসে আছেন। চরণ তাঁর দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে ডাকল, আসুন।

— না। কোথাও যাব না আমি। আপনার যা বলার আছে এখানেই বলুন।

— চরণ! খোকা।

বিশাল কী বলতে চাইছে বুঝতে দেরি হয় না চরণের। এক ঝটকায় ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে বাংলো অভিমুখে হাঁটা দিল। বেচারা বেণীবাবু উপায়ান্তর না দেখে সুড়সুড় করে নেমে এলেন।

— বেণীবাবু মদ খাবেন? বিদেশি ব্রাণ্ডের দামি মদ। চেম্বারে ঢুকে বেণীবাবুকে সোফায় বসতে ইশারা করে বলল বিশাল।

— আমি ড্রিংক করি না। ছোটো করে উত্তর দিলেন বেণীবাবু।

— সেকী মশাই! রাজনীতির লোক মদ খান না? এ তো দেখছি সাপের ব্যাঙে অরুচি হবার মতো ঘটনা। যাকগে আসল কথায় আসা যাক। স্পিনিং মিলে কাজ করে মাসিক কত টাকা মাইনে পান?

— হাজার বারো।

— আমি আপনাকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব। বিনিময়ে আপনি...

— সরি মিস্টার! শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ আমি করতে পারব না।

— কে বলেছে করতে? বোনাস নিয়ে যে গণ্ডগোলের সূচনা হয়েছে আপনাকে তা চাগিয়ে তুলতে হবে।

বেণীবাবু চট করে কোনো উত্তর দিলেন না। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আপনার তাতে কী লাভ?

— আমার লাভক্ষতির হিসাব করে কি আপনার পেট ভরবে? ভরবে না তাই তো? হরতাল, বয়কট, কর্ম-বিরতি ডেকে উধমপুর স্পিনিং মিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি করুন। আপনাকে মালামাল করে দেব।

— তা করতে গিয়ে যদি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অতগুলো লোকের কী হবে?

— নীতিকথা ছাড়ুন তো মশাই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন দেশে কী চলছে। এমএলএ-এমপি-মন্ত্রীদের কথা নাই-বা ধরলাম। পাঁচ-দশ বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বাররা কোটি টাকার সম্পত্তি করে ফেলছে। কোত্থেকে আসছে এত টাকা?

— প্লিজ আমাকে যেতে দিন। বেণীবাবু হাতজোড় করে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করতে থাকলেন।

— নিশ্চয় যাবেন, বেঁধে রাখব না আপনাকে। কিন্তু যতদিন না আমার কাজ হচ্ছে খোকা এখানেই থাকবে।

একথা শুনে বেণীবাবু নেতিয়ে পড়লেন। কোনোরকমে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আপনার কথা মতো আমি কারখানায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলাম। তারপর যদি মালিকপক্ষ দাবি মেনে নিয়ে দু-মাসের মাইনে বোনাস দিতে রাজি হয়ে যায়, তখন কী হবে?

— তখনকার ভাবনা তখন ভাবা যাবে। আপনি কাজ শুরু করুন। বিশাল উঠে গিয়ে আলমারি থেকে পাঁচশো টাকার একটা বাণ্ডিল বার করে এনে বেণীবাবুর হাতে দিয়ে পুনরায় বলল, উধমপুর স্পিনিং মিলে উৎপাদন বন্ধ হলে এইরকম আরও একটা বাণ্ডিল আপনি পাবেন।

বেণীবাবু টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

— হুঁ হুঁ। টিকটিকির মতো মাথা নেড়ে বিশাল বলল, একটা কেন পঞ্চাশটা কথা জিজ্ঞাসা করুন। দেওয়ার মতো হলে সব কথার উত্তর দেব।

— কৈলাসবাবুর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

— আছে একটা সম্পর্ক লতাপাতায়। সে সব শুনে আপনার কাজ নেই। যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল সেটা মন দিয়ে করুন।

— আর-একটা কথা।

— বলুন।

— আপনি কি চান কারখানা একেবারে বন্ধ হয়ে যাক?

— ভবিষ্যৎ সে কথা বলবে। আমি নিজেও জানি না কৈলাসপ্রসাদ রায়ের কতটুকু ক্ষতি করলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কৈলাসপ্রসাদ দ্য ব্লাডি ডগ! বিশালের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার ভয়াবহ পরিণাম এবার তুমি টের পাবে। তোমাকে, তোমার ছেলেমেয়ে কাউকে আমি শান্তিতে মরতে পর্যন্ত দেব না।

কথা বলতে বলতে বিশালের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, গলার শিরা ফুলে উঠল। চোখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে যেন। আর তাকে ঘাঁটানোর সাহস হল না বেণীবাবুর। উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আমার খোকার কী হবে?

— নিয়ে যান। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন এতটুকু বেচাল দেখলে...। আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড মোটেই উজ্জ্বল নয়। আমার ছেলেরা শৃগালের মতো চালাক আর সিংহের মতো হিংস্র। মানুষের গলা কাটতে ওদের হাত কাঁপে না মোটেই। আমি কী বলতে চাইছি, আপনার মতো অভিজ্ঞ লিডারের তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

— খুব বুঝতে পারছি স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে।

— আমার ছেলেরা আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখছে। আপনি কোথায় যান, কী করেন, কী খান সব জানে তারা।

চরণ খোকাকে ছেড়ে দিলে সে ছুটে বাবার কাছে গেল। বেণীবাবু তাকে কোলে তুলে নিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বেলার দিকে পৌরপ্রধান, স্থানীয় এমপি তথা বিরোধী দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতির সঙ্গে মিটিং ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পার্টি অফিসে গিয়েছিল বিশাল। এ-কথা সে-কথার ফাঁকে সভাপতি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অফার দিলে, বিশাল তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে জানিয়ে দিয়েছে, রাজনীতিতে আমার ইনটারেস্ট নেই। দল চাইলে বড়োজোর অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারি।

তারপরেও সভাপতিমশাই বিশালকে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার কথা বলেছেন। তার যে পেশা তাতে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংস্রব রেখে চলা উত্তম পন্থা। এতদিন তা-ই করে এসেছে সে, সব রাজনৈতিক দলকেই ইলেকশনের সময় মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছে। কিন্তু সরাসরি রাজনীতিতে নামলে একপক্ষ বেজার হবে। বিরুদ্ধপক্ষের প্রচারের মূল এজেন্ডাই হবে তার পেশা।

এই পরিস্থিতে সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতলেও স্বস্তিতে দিনযাপন করতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দল উঠে-পড়ে পিছনে লাগবে। মৃতপ্রায় কেসগুলো খুঁচিয়ে জ্যান্ত করা হবে। এসপি সাধন দত্ত এমন একটা সুযোগের সন্ধানে রয়েছেন। নতুন করে অক্সিজেন পেয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হবেন তিনিও।

বাংলোয় নিজের চেম্বারে বসে বিশাল এইসব কথা ভাবছিল। এমন সময় চরণ এক অশীতিপর বৃদ্ধকে নিয়ে ঢুকল। বৃদ্ধের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তাঁকে দেখেই বিশাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন স্যার।

বিশালের কথায় বৃদ্ধ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কে বাবা তুমি! তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?

— স্যার আমি রহমান মাঝির নাতি বিশাল।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরব দৃষ্টিতে বিশালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হয়তো বা তিনি গফুর বস্তির সরকার পোষিত পাঠশালার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে নিলেন, যখন তিনি সেই পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপর বললেন, তুমি ভারতীর ছেলে বিশাল?

— হ্যাঁ স্যার। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন স্যার। বসুন। তারপর চরণকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যারের জন্য চায়ের ব্যবস্থা কর।

— থাক বাবা ওসবের দরকার নেই। আমি যে কথা বলতে এসেছিলাম...

— আপনার সব কথা শুনব স্যার। বসুন, ধাতস্থ হন, তারপর।

মাস্টারমশাই সঙ্গে করে নাতনিকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিশাল সম্পর্কে লোকমুখে এমন সব কথা শুনেছেন তাতে করে নাতনিকে নিয়ে ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি। মানুষটা কেমন, কী রকম আচরণ করে ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হতে তাকে বাইরে রেখে একা এসেছেন। যখন জানতে পারলেন ছেলেটি তাঁরই ছাত্র, স্বস্তি-শ্বাস নিয়ে বুক ভরালেন। তারপর চেয়ারে বসে চরণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাইরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে একটু ডেকে দাও না বাবা।

চরণ চট করে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে বছর আঠারোর একটি মেয়ে ভিতরে ঢুকল। তার দিকে ইঙ্গিত করে বৃদ্ধ বললেন, এ আমার নাতনি সুলতা। গার্লস কলেজে পড়ে। ক-দিন ধরে ও কলেজ করতে পারছে না।

— কী অসুবিধা বলুন স্যার। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওর জন্য। তারপর সুলতাকে বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো।

মেয়েটি বসল। বৃদ্ধ বললেন, ক-দিন ধরে কিছু ছেলে ওকে ডিস্টার্ব করছে। শুনলাম ছেলেগুলো নাকি তোমার দলের।

— আমার দলের ছেলে! কোথাও একটা ভুল হচ্ছে স্যার। অতঃপর মুহূর্তের জন্য থেমে বিশাল মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় এই ঘটনা ঘটেছে?

— গির্জামোড়ে বুড়োর চায়ের দোকানে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। বাস থেকে নামলেই পিছু ধাওয়া করে। একদিন তো ওড়না ধরে টানাটানি শুরু করেছিল। সেইসময় পুলিশের গাড়ি না এলে কী যে হত! ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সুলতা।

— শহরে অনেকে আমার নাম ভাঙিয়ে খারাপ কাজ করে শুনতে পাই। এতদিন গা করিনি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় কলেজ-পড়ুয়া মেয়ের সঙ্গে নোংরামি! দ্যাটস ইনটলারেবল।

চরণ দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধ ও তার নাতনির হাতে কাপ ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল কী কেস? বিশাল সংক্ষেপে ঘটনার কথা শোনালে সে বলল, আমাদের সরাসরি না জড়ানোই ভালো। তুমি গোলদারবাবুকে কেসটা দেখতে বলো।

— কে গোলদারবাবু? জিজ্ঞাসা করলেন মাস্টারমশাই।

বিশাল গোলদারবাবুর পরিচয় দিলে মাস্টারমশাই পুনরায় বললেন, পুলিশকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা এখনও পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নেয়নি।

— আমি দেখছি স্যার। টেবিল থেকে মোবাইল নিয়ে ওসির নম্বরে রিং করল বিশাল। তিনি হ্যালো করলে ঘটনার উল্লেখ করে বলল, মেয়েটি আমার আত্মীয়। দ্রুত স্টেপ নিন, আমাকে ফিল্ডে নামতে হলে কিন্তু...। ওকে থ্যাংকস।

ফোন রেখে দিয়ে বিশাল মাস্টারমশাইকে বলল, আপনি নিশ্চিত থাকুন স্যার। কাল থেকে কেউ আপনার নাতনিকে ডিস্টার্ব করবে না।

— ধন্যবাদ বিশাল। তুমি আমাকে কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করলে।

— ধন্যবাদ কেন স্যার। আশীর্বাদ করুন। বিশাল উবু হয়ে স্যারকে প্রণাম করল।

— আশীর্বাদ করব! কী বলে আশীর্বাদ করব বাবা? মাস্টারমশাইয়ের বুকের খাঁচা শূন্য করে এক ছটাক বাতাস বেরিয়ে এল। কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে বললেন, এখানে আমি আসতে চাইনি। সারাজীবন ছাত্রছাত্রীদের সৎ মানুষ হবার শিক্ষা দিয়েছি। শেষে কিনা একজন ড্রাগ মাফিয়ার কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইব? বিবেক সায় দিচ্ছিল না। শুধু বাপ-মরা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে...। যদি জানতাম তুমি আমার বিপথগামী ছাত্র, কোনোদিন এখানে আসতাম না।

থামলেন বৃদ্ধ। দম নিয়ে পুনরায় বলতে থাকলেন, দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছি। বস্তির ছেলেমেয়েগুলো মাধ্যমিকের গণ্ডি ছাড়াবার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রোজগারের পথ খুঁজে নিয়েছে। তুমিই প্রথম মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভরতি হয়েছ। সেই তুমিই কিনা শেষপর্যন্ত মৃত্যুর ব্যাপারী হয়ে উঠলে?

বিশাল কোনো কথা বলতে পারল না। বলির পশুর মতো অসহায় দৃষ্টি নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তিনি বলতে থাকলেন, বাবা আমার রিকোয়েস্ট এই পথ ছেড়ে দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করো।

মাস্টারমশাই আর দাঁড়ালেন না। নাতনিকে নিয়ে দ্রুত চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিশাল অসহায়ের মতো ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্যা যেন বিশালকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। পিতৃপরিচয় জানা ছিল না। সে সব নিয়ে কোনোদিন বিশেষ ভাবেওনি। মায়ের মুখ থেকে সবকিছু শোনার পর অদম্য জেদ তাকে পেয়ে বসেছে। যেমন করে হোক কৈলাসপ্রসাদ রায়কে খুঁজে পেতে হবে। শুধু খুঁজে পেলেই হবে না, তার থেকে জন্মগত অধিকার তথা সন্তানের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। এ তার ন্যায্য পাওনা, আদায় না করে ছাড়বে কেন?

আর আছে প্রফেশনাল কমপিটিশন। কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে সে ছিল অবিনাশ চৌধুরীর আজ্ঞাবহ বেতনভুক কর্মচারী। এখন সে-ই ব্যাবসার মালিক। তিল তিল করে গড়ে তুলেছে বিশাল সাম্রাজ্য। বিপরীতে গদিচ্যুত সম্রাট অবিনাশ চৌধুরী হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পেতে মরিয়া। তাকে খুন করার জন্য একাধিক লোক নিয়োগ করেছেন। একটার পর একটা অতর্কিত হামলা চালিয়ে তারা ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। কঠোর হাতে মোকাবেলা না করলেই নয়।

তৃতীয়ত সেই লোকটার খোঁজ নিতে হবে, যার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর মা হার্ট ফেল করেছে। কে সে? জানতে হবে সে মাকে কী বলছিল? ইত্যাদি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে বুঝতে পারেনি। মোবাইলের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসল সে। মোবাইলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে স্ক্রিনে চোখ রাখল। ওসি গোলদারবাবুর কল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলটা রিসিভ করল।

— বলুন গোলদারবাবু।

— আপনার জন্য একটা সুসংবাদ আছে।

— কী রকম?

— বসির পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

— কোন বসির?

— সে কী মশাই! আপনি কানা বসিরকে চেনেন না?

— দুনিয়ার সব লোককে চিনতে হবে এমন কথা আছে নাকি? এনিওয়ে কেন তাকে গ্রেপ্তার করেছেন? তার খবর আমাকেই-বা দিচ্ছেন কেন?

বিশালের কথায় গোলদারবাবু খানিকটা কনফিউজড হয়ে পড়লেন। ঢোক গিলে বললেন, না মানে...। রাতে পেট্রল ডিউটিতে বের হয়ে বসিরকে আপনার ফ্লাটের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে সন্দেহ হয়। চ্যালেঞ্জ করতেই ব্যাটা দে ছুট। তাড়া করে ধরেছি। লকআপে পুরে দু-চার ঘা দিতে যা বলল তাতে আমার মাথা খারাপের জোগাড়।

— কী বলেছে সে?

— অবিনাশ চৌধুরীর লোক সে। আপনাকে খুন করতে শহরে এসেছে। ড্রিমনাইট বারের বোমব্লাস্টের সঙ্গেও সে জড়িত।

— আর কিছু?

— মিস রুমানাও তাদের দলে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না বিশাল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, রুমানার দিকটা আমি বুঝে নেব। আপনি শুধু বসিরের ট্রিটমেন্ট করুন।

বসির গ্রেপ্তার হবার পর থেকে রুমানাকে নিয়ে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে বিশাল। চাপে পড়ে বসির তার নাম নিলে পুলিশ ছেড়ে কথা বলবে না। অপরদিকে ফেঁসে যাবার ভয়ে অবিনাশ চৌধুরী লোক লাগিয়ে খুন করাতে পারে। বিশাল চায় না তার কোনো ক্ষতি হোক। কেন চায় না? বিশালের কাছেও হয়তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই।

সকাল সকাল রুমানার ভাড়াবাড়িতে গিয়ে পৌঁছোল বিশাল। তখনও সে ঘুমিয়ে। বাড়িওয়ালি ডেকে দিলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এল।

— বসিরকে গতকাল পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তুমি মোটেও নিরাপদ নও। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গে যেতে হবে।

— কোথায়?

— আমার বাসায়।

— আপনার স্ত্রী রাগ করবেন না?

— না করাটাই অস্বাভাবিক। তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

— যদি সে কথা ওঠে কী বলবেন?

— যা সত্য। উই আর ফ্রেন্ড।

— সত্যি কী তাই! আমরা কি কোনোসময় বন্ধু ছিলাম, না এখন আছি?

বিশাল সরাসরি এই কথার উত্তর দিল না। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, হারি আপ রুমানা। তৈরি হয়ে নাও। আমাকে আবার অন্য কাজে যেতে হবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ফ্ল্যাট এখনও বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। শহরের সবচেয়ে বড়ো ডেকরেশন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দিনরাত এক করে কাজ করছে তারা। অসুবিধা হলেও ততদিন সপরিবারে বাংলোয় থাকতে হচ্ছে। গ্যাস-স্টোভ, চেয়ার-টেবিল লাগিয়ে বসার ঘরটাকে ডাইনিং কাম কিচেনে রূপান্তর করে নিয়েছে।

এরই মাঝে রুমানা যুক্ত হয়েছে পরিবারে। তাকে নিয়ে ঝুমার সঙ্গে একপ্রস্থ বাকবিতন্ডা হয়ে গেছে বিশালের। রুমানা থাকলে সে চলে যাবে এমন কথাও বলেছিল ঝুমা। অতঃপর বিস্তর তোয়াজ করে তবে তাকে রাজি করানো গেছে। সেও প্রায় আট-দশদিন হতে চলল।

সেদিন দুপুরে খেতে বসে বিশাল লক্ষ করল এর মধ্যে ঝুমা আর রুমানার মাঝে সখ্য গড়ে উঠেছে। অবাক না হয়ে পারে না বিশাল। খাওয়া শেষ করে স্ত্রীকে একান্তে ডেকে জানতে চাইল, ব্যাপার কী?

— ও তুমি সইতে পারবে না। ভ্রূকুটি করে বলল ঝুমা। তারপর দ্রুতপায়ে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিশাল পিছু ধাওয়া করে গিয়ে দেখে রুমানা বামহাতের ভরে আধশোয়া অবস্থায় মোবাইল ঘাঁটছে।

বিশাল ঝুমাকে বলল,

— আগামী সপ্তাহে রুমানা মুম্বাই চলে যাবে।

— সেকি! কেন?

— বলিউডের একজন নামকরা ডিরেক্টর তাঁর নতুন ফিল্‌মে রুমানাকে হিরোইনের রোল দেবেন বলেছেন।

— এ তো দারুণ খুশির খবর। কবে যাচ্ছ?

— আমার এক পিসতুতো দাদা মুম্বাই ফিল্‌ম ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যামেরাম্যান। উনিই বিষয়টি ডিল করছেন। গত সন্ধ্যায় ওর সাথে কথা হয়েছে, আগামী শুক্রবার সেখানে পৌঁছোতে হবে।

দেয়ালে টাঙানো ডিজিট্যাল ঘড়িটার দিকে তাকাল বিশাল। এখন বাজে দুটো বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। বিকেল সাড়ে চারটায় টাউন হলে যাবার আছে। আন্তর্জাতিক স্তরের একটি এনজিও বস্তিবাসীদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে শহরে কাজ করছে অনেকদিন ধরে। তারা একটি সভার আয়োজন করেছে। উপস্থিত থাকবেন শহরের নানাস্তরের বিশিষ্টজন। বিশালকে সভার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাধারণত সে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যায়

না। কিন্তু ওদের ম্যানেজার মিস্টার ডিকোস্টার কাতর অনুরোধে শেষপর্যন্ত কথা দিয়ে ফেলেছে।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে পোশাক পালটাতে শুরু করল। একটু বাদে ঝুমা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, রুমানার ব্যাপারে কী যেন জানতে চাইছিলে?

প্যান্টের চেন টানতে গিয়ে থমকাল বিশাল। সামান্য ঘাড় উঁচু করে স্ত্রীর মুখপানে তাকিয়ে ধাঁ করে চেন টেনে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে ঝুমা প্রায় তার নাকের ডগায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঝট করে তাকে বুকে চেপে ধরে বিশাল বলল, রুমানা তোমাকে এত তাড়াতাড়ি বশ করল কোন জাদুবলে?

— তুমি খুশি তো!

— মেয়েটির সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। ক-দিন সে আমাদের সঙ্গে থাকবে। ভয় করছিলাম তুমি হয়তো...

— আমি খুব ঝগড়ুটে, অশান্তিপ্রিয় তাই না?

ফিল্‌মি হিরোদের মতো বিশেষ কায়দায় চকিতে চেয়ারে বসে ঝুমাকে টেনে কোলের উপর বসিয়ে নিল বিশাল। তারপর স্ত্রীর গালে নিজের গাল ঠেকিয়ে মিষ্টি করে বলল, কোন শালা একথা বলে? মেরে মুখ ভেঙে দেব না?

— তোশামোদ করছ?

— বউ জিনিসটাই তো তোশামোদ করার জন্য। ঝুমার গালে চকাত করে একটা চুমু ঠুকে দিয়ে বলল বিশাল।

— অসভ্য কোথাকারের। কেউ দেখে ফেলে যদি...

— দেখে দেখুক। আমার বউকে আমি চুমু খাব তাতে লোকের কী?

বিশাল আর-একটু চেপে ধরতে গেলে ঝুমা বল প্রয়োগ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, রুমানাকে তুমি খুব ভালোবাসো তাই না?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিশাল। পুনরায় স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে মিথ্যে বলব না ঝুমা। ভালোবাসা নাকি ভালোলাগা আমি জানি না। তোমার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার আগে আমার হৃদয়মাঝে ওর জন্য জায়গা তৈরি হয়েছিল। যদিও এখন...

— কী এখন?

— ওরকম হাজার রুমানাকে কুরবানি দিতে পারি তোমার জন্য। বিশাল পুনরায় স্ত্রীর কপালে চুম্বন স্পর্শ এঁকে দিল।

— কী ব্যাপার বলো দেখিনি, আজ এত তোয়াজ করছ?

— ভালোবাসার কথা বললে তোয়াজ করা হয় বুঝি?

— তোমাদের পুরুষ জাতটাকে আমার ভালো করে চেনা আছে। তোমাদের মনে এক কথা, মুখে আর এক...

রেডি হয়ে বেরোনোর সময় ঝুমা বলল, চরণকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

— চরণ! আরে ছোঁড়াটা আছে কোথায় সারাদিন? একবার ফোনও করল না, ব্যাপার কী? নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় চরণের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল বিশাল। এমনতো কোনোদিন ঘটেনি, চরণ কোথাও গেছে অথচ বিশাল জানে না। কোথায় যেতে পারে সে? কোনোরকম বিপদে পড়েনি তো ছেলেটা? উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল বিশাল। ত্রস্তহাতে ফোন তুলে নিয়ে চরণের নম্বর ডায়াল করল। বার চারেক কল করা হল, রিং হয়ে গেল কিন্তু কেউ রিসিভ করল না। তাতে করে বিশালের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল।

একটু থেমে স্পিকার লাউড করে দিয়ে পুনরায় কল করল। ওপ্রান্ত থেকে মহিলা কণ্ঠের রেকর্ডিং ভয়েস ভেসে এল, আপনার ডায়াল করা নম্বরটি বতর্মানে সুইচ অফ রয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে ভয়েস মেসেজ...

বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিয়ে ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ল বিশাল। তখন রুমানা বলল, অত টেনশন করছেন কেন? উনি হয়তো অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

— ওকে তুমি চেনো না তাই একথা বলছ। বাথরুমের বাইরে হিসু করতে গেলেও ও আমাকে বলে যায়। অথচ আজ এত বেলা পর্যন্ত ওর দেখা নেই।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিশাল। দ্রুতপায়ে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পায়চারি করতে থাকল। তাল মিলিয়ে ঝড় বইতে থাকে তার অন্তরগহিন তোলপাড় করে। এত বড়ো ভুল হল কী করে? এতক্ষণ কেন তার অনুপস্থিতি আমার চোখে পড়ল না? অতঃপর ঝুমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কেন ওর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলে না?

চরণের অনুপস্থিতি আমার চোখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু সারাদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই, আমি তা কী করে জানব?

— তাই তো! তুমি কী করে জানবে? লিয়াকত। এই লিয়াকত। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে চেম্বারের দিকে যেতে যেতে উচ্চস্বরে বার দুয়েক ডাক দিতে ছুটে এল লিয়াকত।

— কিছু বলছেন স্যার?

— চরণের সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়েছে?

— না।

— ও কোথায় গেছে বলতে পারো?

— জানি না তো স্যার।

— ফোন করেনি?

— না স্যার।

— হুম! তুমি এখন এসো।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল লিয়াকত। বিশাল সেখানে চুপচাপ বসে থাকল।

অল্পসময়ের ব্যবধানে সংঘটিত পরপর বিপর্যয়ের অতর্কিত গেরিলা হানায় বিশাল রীতিমতো বিপর্যস্ত। ফ্ল্যাটে হামলা, ভাঙচুর, কলিকে ধর্ষণ। বসির গ্রেপ্তার। সর্বশেষ চরণ লা-পাতা। ঘটনাক্রম পর্যলোচনা করে বিশাল বিশেষভাবে ভাবিত না হয়ে পারল না। কিন্তু সে সেনাপতি, তার ভয় পেলে চলবে কেন? ঝঞ্ঝা যতই আসুক তাকে লড়তে হবে বুক চিতিয়ে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল বাংলো থেকে।

বিশাল তখন নার্সিংহোম হয়ে টাউনহলের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা মোবাইল ফোনটা রিনরিন করে বেজে উঠল। আড় চোখে তাকিয়ে স্ক্রিনে চরণের নাম দেখে একমুহূর্ত দেরি না করে কল রিসিভ করল সে।

— কোথায় আছিস তুই? সারাদিন তোর খোঁজ নেই কেন?

— শাটআপ ননসেন্স! আমাকে না জানিয়ে শহরের বাইরে যাবার সাহস হল কী করে তোর?

— রাখ তোর সারপ্রাইজ! শালা টেনশনে আমার ব্লাড প্রেসার মাথায় উঠে গেছে। আর উনি গেছেন মেয়ে দেখতে! ফিরে আয় তোর বিয়ে করার শখ আমি মিটিয়ে তবে ছাড়ব।

চরণের আরও কিছু বলার ছিল। বিশাল আমল দিল না। লাইন কেটে দিয়ে মোবাইল সেটটা পাশের সিটে ছুড়ে দিয়ে ড্রাইভিঙে মনোনিবেশ করল।

গাড়ি টাউনহল চত্বরে প্রবেশ করতে একজন ভলান্টিয়ার ছুটে এল। সে গাড়ি পার্ক করার জায়গা দেখিয়ে দিলে বিশাল সেখানে গেল। অনেকগুলো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশে এক চিলতে জায়গা খুঁজে নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর রিমোটের সাহায্যে ভিতর থেকে জানালার কাচ তুলে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল। ঠিক তখনই তার মাথায় একটি জিজ্ঞাসার উদয় হল, চরণ বলল মেয়ে দেখতে গেছে। সত্যি কি তাই? তাহলে আমার কল রিসিভ না করে সুইচ অফ করে দিল কেন? ও কি কোনো গেম খেলছে?

কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে দরজা লক করল বিশাল। তারপর লম্বা পা ফেলে হলের সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে মিস্টার ডিকোস্টা খবর পেয়ে গেছেন। তিনি ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এসে প্রধান অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা সহকারে হলে নিয়ে গিয়ে মঞ্চে বসালেন।

সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে লিয়াকত একজনকে নিয়ে এল। ঢ্যাঙা-পাতলা শরীর। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ঘোলাটে চোখ। চেহারায় চোয়াড়ে ভাব। ছেলেটির নাম বুজুয়া। অপরদিকে বসির তাগড়া জোয়ান। তার শরীরে অসুরের শক্তি। সে কি তার সঙ্গে পেরে উঠবে?

বিশাল সংশয় প্রকাশ করলে বুজুয়া বুক ঠুকে বলল, মাংস নিয়ে কী করবেন স্যার? আসল হল মানসিক বল। এই শরীর নিয়ে চার-চারটে মানুষকে মুরগির মতো জবাই করেছি। এক বিছানায় তিন ছুঁড়িকে নিয়ে...। হেঁ হেঁ হেঁ। হলদেটে দাঁত বার করে হেসে উঠল বুজুয়া।

— আজ তোমাকে কী করতে হবে জানো? লিয়াকত কিছু বলেছে?

— না জেনে কী আর এসেছি স্যার? পেশাদার মানুষ আমি, পয়সা দেবেন কাজ বুঝে নেবেন।

— হুম! কত দিতে হবে তোমাকে?

— লকআপের মধ্যে খুন, ভীষণ রিস্কি কাজ। আমি নিজেও খুন হয়ে যেতে পারি। লাখের কমে হবে না স্যার।

কিছু বলল না বিশাল। উঠে গিয়ে আলমারির ড্রয়ার থেকে পাঁচশো-র নোটের একটা বান্ডিল এনে টেবিলে রেখে বলল, পঞ্চাশ হাজার আছে। বাকি টাকা কাজ হওয়ার পর পাবে।

— যদি আমার কিছু হয়ে যায়?

— ডাবল টাকা লিয়াকত তোমার পরিবারের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর কিছু বলার আছে তোমার?

টাকার বান্ডিলটা পকেটে ভরে বুজুয়া জানতে চাইল কখন থানায় যেতে হবে। উত্তরে বিশাল বলল, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। রাত আটটা নাগাদ চরণ তোমাকে নিয়ে স্টেডিয়ামের আশেপাশে অপেক্ষা করবে। সময় মতো পুলিশ এসে নিয়ে যাবে।

— সমঝ গিয়া স্যার।

— আর-একটা কথা।

— বলুন!

— কোনোভাবে যদি ফেঁসে যাও ভুলেও আমাদের কথা মুখে আনবে না।

— কখন মুখ খুলতে হয় আর কখন মুখ বন্ধ রাখতে হয়, সে জ্ঞান আমার আছে স্যার।

— গুড! এখন তুমি আসতে পারো।

বুজুয়া বেরিয়ে গেলে বিশাল লিয়াকতকে জিজ্ঞাসা করল, ওর ফ্যামিলিতে আর কে কে আছে?

— অন্ধ মা ছাড়া কেউ নেই।

— বিয়ে করেনি?

— করেছিল স্যার। ক-দিন হল বউটা পাড়ার এক বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে। এ ব্যাটাতো বছরে আট-দশ মাস জেলেই থাকে। জোয়ান মেয়ে কদ্দিন আর উপোস করে থাকবে। পালিয়ে গিয়ে ভালোই করেছে, কী বলেন স্যার?

— অনেক খবর রাখো দেখছি। যাতায়াত ছিল নাকি?

— না স্যার! অপ্রস্তুত লিয়াকত হাত কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে গেল।

— বসিরের খবর কী গোলদারবাবু? লিয়াকত ঘর ছেড়ে যেতে গোলদারবাবুকে ফোনে ধরল বিশাল।

— আপনার কথা মতো ওকে কোর্ট থেকে চারদিনের রিমান্ডে নিয়ে এসেছি।

— গুড! ঠিক রাত আটটার সময় স্টেডিয়ামের এদিকে রেড করবেন। লিয়াকত সেখানে একজনকে নিয়ে অপেক্ষা করবে। তাকে...

— আর বলতে হবে না আপনাকে। এই করে করে চুল সাদা করে ফেললাম মশাই। হেঁ হেঁ হেঁ! বলছিলাম কি গরিবের কথা যেন ভুলে যাবেন না বিশালবাবু।

— গিন্নিকে অগ্রিম সুখবর দিয়ে রাখুন। ডায়মন্ড নেকলেস ঠিক সময় আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত। বিশেষ করে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গঙ্গানদীর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। সরকারের তরফে নদী-তীরবর্তী এলাকার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার আবেদন জানিয়ে বেতার ও দূরদর্শনে বারবার সতর্কবাণী প্রচার করা হচ্ছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার যথেষ্ট ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন। ডিএম থেকে শুরু করে প্রশাসনের ছোটোবড়ো কর্তার ছুটি বাতিল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন ত্রাণসামগ্রী বিলিবন্টনে যেন রাজনৈতিক রং দেখা না হয়। দুর্গত একটা মানুষও যেন অভুক্ত না থাকে।

নদীর পশ্চিম পাড়ে ব্রিজ থেকে প্রায় বিশ ফুট নীচে নদীপাড়ের সমতলে গফুর বস্তি। এই বস্তির মাটিতে তার বাল্য-কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। মা,

দাদু-দিদা, বন্ধু-বান্ধব মিলে কত সুখস্মৃতি জমে আছে মনের মণিকোঠায়। কিছুই ভোলেনি বিশাল। আজকাল নিয়মিত বস্তিতে আসতে পারে না। দাদু-দিদার মৃত্যুর দিনগুলিতে অবশ্যই আসে। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করে যায়। খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করে। ফকিরবাবার মাজারে চাদর চড়ায়।

চরণকে সঙ্গে নিয়ে বস্তিতে এসে বিশাল রীতিমতো বিস্মিত হল। চারদিকে শুধু জল আর জল। মুরগির খুপরির মতো ছোটো ছোটো ঘরগুলি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অধিকাংশ বস্তিবাসীকে স্কুলবাড়িতে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বড়ো রাস্তার ধারে পলিথিনের তাঁবু খাটিয়ে সপরিবারে অবস্থান করছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে একটি নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলবাড়ি থেকে লোক নিয়ে এসে রাস্তার উপর নামিয়ে দিয়ে, ফের এখান থেকে লোক নিয়ে যাচ্ছে স্কুলে।

বিশালরা নৌকো করে গিয়ে স্কুলে পৌঁছোতে অনেকে এসে তাদের ঘিরে ধরল। ভিড়ের মাঝে পরিচিত এক বৃদ্ধাকে দেখে এগিয়ে গেল বিশাল। — রওজানানি আমাকে চিনতে পারছ?

বৃদ্ধা চোখে কম দেখে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ পিটপিট করে দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে চিনতে পেরে বলল, তুই ভারতীর বেটা লোস! রহমানের লাতি?

— এইতো চিনতে পেরেছ।

বৃদ্ধা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে যা বলল তার মর্মার্থ মোটামুটি এরকম, হঠাৎ বন্যায় ঘরবাড়ি নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের গৃহস্থালির আসবাবপত্র, গৃহপালিত পশু ভেসে গেছে। দেয়াল চাপা পড়ে দুটো শিশু মারা গেছে। দুই বুড়ি আর এক জোয়ানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ওপর সরকারি ত্রাণসামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল। যতটুকু এসেছে তাও ঠিকভাবে বিলিবন্টন করা হচ্ছে না। ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ।

এইসব কথা জানিয়ে বৃদ্ধা বিশালকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুন্যাছি তু খুব বড়োলোক হোলছি। ম্যালা টাকা হোলছে তোর। হামারঘো ল্যাগি কিছু কর ভ্যাই।

— চিন্তা কোরো না নানি। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব।

একথা শুনে রওজাবুড়ি আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে সকলের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, ওরে তুরা ইদিকে আয়। ইদিকে আয়। হামারঘো ভারতীর ব্যাটা কী বুলছে শুন সবাই।

বুড়ির কথায় গোলমাল অনেকটা শান্ত হল। তখন বিশাল বলল, অধৈর্য হোয়ো না কেউ। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে তোমাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব আমার। সবার ঘরও আমি বানিয়ে দেব।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবতি ভিড় ঠেলে সামনে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হামার কী হবে গো? হামার মরদ বানের জলে ভ্যাসি গেলছে।

এক মা তার হারানো শিশুর নাম ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, ওরে হামার কোলজার টুকর‍্যা কোতি হার‍্যাঙ গেলি বাপ। তোকে ছ্যাড়ি হামি ক্যামুন করি বাঁচব!

দুখি মানুষকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার জানা নেই। রাজনৈতিক নেতাদের মতো মিথ্যে স্তুতিবাক্য বর্ষণও করতে পারে না। আবার একেবারে কিছু না বললেও চলে না। মনে মনে কয়েকটি বাক্য গুছিয়ে নিয়ে বলতে থাকল, তোমাদের কষ্ট আমি অনুভব করতে পারি। বন্যায় যে ক্ষতি তোমাদের হয়েছে, কোনোভাবেই তা পূরণ করা সম্ভব নয়। তবুও আমি যতটা পারি চেষ্টা করব।

এমন সময় একটা ফোন কল এল। কলটা রিসিভ করে ও-প্রান্তের কথা শুনল চুপচাপ। তারপর 'ঠিক আছে ওখানে ওপেক্ষা কর' বলে ফোন কেটে দিয়ে চরণকে বলল, এখান থেকে ক-জন ছেলে নিয়ে ব্রিজের উপরে যা। লরি করে মালপত্র এসেছে, নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।

— তুমি একা থাকবে?

— কেন রে? এরা সবাই তো আমার নিজের লোক। তুই যা, আমার জন্য ভাবতে হবে না।

চরণ আর কথা বাড়াল না। ততক্ষণে কিছু ছেলে স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছে। চরণ তাদেরকে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসল। বিশাল ভিড়ের মাঝে ঢুকে কার কী প্রয়োজন খোঁজখবর নিতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে অন্য একটি নৌকা স্থানীয় বিধায়ক ও কাউন্সিলরকে নিয়ে ভিড়ল, সঙ্গে একদল পুলিশ। তাদের দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ল দুর্গত মানুষজন। জোয়ান ছেলেরা হই হই করে তেড়ে গেল। বিশাল ভিড় ঠেলে বাইরে এসে ছেলেগুলোকে নিরস্ত্র করে বলল, তোমরা শান্ত হও। আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলছি।

এগিয়ে গেল বিশাল। কোনোরকম ভণিতা না করে জনপ্রতিনিধিদ্বয়কে লক্ষ করে বলল, এতক্ষণে আপনাদের ঘুম ভাঙল?

— না মানে আমি একটু দেরিতে সংবাদ পেয়েছি। তারপর মালপত্র জোগাড় করতে অনেকটা সময় চলে গেল। বললেন বিধায়ক।

তিনি অন্য এলাকার মানুষ। মাস তিনেক হল নির্বাচিত হয়েছেন। বিশালের নাম শুনেছেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। কাউন্সিলর স্থানীয় ছেলে, বিশালকে ভালোমতো চেনে। সে এগিয়ে এসে বলল, বিশালবাবু আপনি এখানে?

— এখানে মানে! এই বস্তির মাটি আমার মা। এখানে আমার জন্ম তুমি জানো না? ওসব কথা এখন থাক। ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা কদ্দুর কী করেছ বলো?

— আপাতত কুইন্ট্যাল পাঁচেক চিঁড়া ও কলার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। ত্রিপল আছে খান পঞ্চাশেক।

— হোয়াট ননসেন্স। দুশোর অধিক ঝুপড়ি ভেসে গেছে। হাজারের কাছাকাছি মানুষ বানভাসি। তুমি কি এদের সঙ্গে মশকরা করতে এসেছ?

— সারা বাংলা বন্যা-কবলিত। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি। আপনিই বলুন হঠাৎ করে এত ক্ষতিপূরণ দেওয়া কি সম্ভব? একটু সময় দিন, মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন...

ইতোমধ্যে কাউন্সিলরের কাছ থেকে বিশালের পরিচয় জেনে নিয়েছেন বিধায়ক। তাতে করে তাঁর উন্নত অহংভাব অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, বিশালবাবু আপনি শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এলাকায় আপনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্লিজ আমাকে একটু হেল্‌প করুন। কথা দিচ্ছি দুর্গতদের কোনো অসুবিধা থাকবে না। আজ না হয় কাল আমি এদের সব দাবি পূরণ করে দেব।

— আমি আর কী করতে পারি মশাই? আপনি এলাকার বিধায়ক। দুঃখের দিনে পাশে থাকবেন এই আশাতেই না ওরা আপনাকে নির্বাচিত করেছে। আমি বড়োজোর পাবলিক অশান্তি না করে সেদিকটা ম্যানেজ করতে পারি।

এরপর বিশাল কাউন্সিলর ছেলেটাকে নিয়ে পড়ল। — তুমি স্থানীয় ছেলে। আরও আগে তোমার তৎপর হওয়া উচিত ছিল।

— আমি মানে, কাল রাত থেকেই...

কাউন্সিলর মিনমিন করে কিছু বলল। কিন্তু সেই সময় একটি যন্ত্রচালিত বড়ো নৌকা কর্কশ আর্তনাদ করতে করতে কাছাকাছি এসে পড়ায় তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

নৌকা করে সরকারি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছেন এসপি সাধন দত্ত। গোলদারবাবুও আছেন দলবল নিয়ে। আছে কিছু স্বেচ্ছাসেবক যুবক। নৌকা ঘাটে লাগতে এসপির নির্দেশে গোলদারবাবু দলবলসহ নেমে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন যাতে ত্রাণসামগ্রী লুট না হয়ে যায়।

এসপি নৌকা থেকে নেমে বিশালকে দেখে বিস্মিত হলেন, খানিকটা বিরক্তও।

— তুমি এখানে?

— আজ্ঞে না এসে পারলাম না স্যার। এরা সবাই আমার আপনজন।

— য়ু আর দ্য...। কিছু বলতে গিয়েও কথা শেষ করলেন না এসপি। বিধায়ক দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সেদিকে ছুটে গেলেন। অভিবাদন জানিয়ে বলেন, ত্রাণসামগ্রী এসে গেছে। শুভ কাজ আপনার পবিত্র হাত দিয়ে শুরু হোক।

— সেই ভালো। আমাকে আবার অন্য এক জায়গায় যেতে হবে।

এসপি ভিড় সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে আগে আগে চলেছেন। পিছনে

বিধায়ক-কাউন্সিলর। ঠিক যেভাবে রাখালবালক গোরু-ছাগল জনবহুল রাস্তা পার করে। গণতন্ত্রের এ এক অপার কারিশ্মা! ফোর পাশ নেতা আইএএস, আইপিএসদের উপর খবরদারি করে। অফিসাররাও তেমনি নেতার পদতলে ব্যক্তিত্ব বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলেন।

নৌকার কাছে পৌঁছে অফিসার বন্যাদুর্গত মানুষজনকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বলতে থাকলেন, সবাই লাইনে দাঁড়াও। এমএলএ সাহেব নিজে তোমাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেবেন।

চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত, বস্তির মানুষের পেটে দানাপানি পড়েনি। খাবার পাওয়া যাবে শোনামাত্র তাদের হামলে পড়ার কথা। অথচ কেউ এসপি-র কথায় সাড়া দিল না। যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। একজন ভিড় ঠেলে সামনে এসে বলল, মাত্র চার বস্তা চিঁড়ে এনেছেন। ক-জনকে দেবেন? আমাদের লাগবে না, ফেরত নিয়ে যান।

— হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের লাগবে না।

— লাগবে না। লাগবে না।

— এমএলএ গো ব্যাক।

— গো ব্যাক। গো ব্যাক।

সম্মিলিত চিৎকারে বিধায়ক ভড়কে গিয়ে এসপির দিকে তাকালেন। এসপি জনগণকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে গেলেন। তাতে কোলাহল আরও মুখরিত হয়ে উঠল। তখন তিনি বিধায়ক এসপি-কে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বললেন। এসপি-র চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি বিশালের মুখোমুখি হলেন।

— কী ব্যাপার! এরা ত্রাণ নেবে না কেন?

— আমি তো স্যার সে কথাই বলছি। সরকারি মাল যা পাওয়া যায় তাই লাভ। কিন্তু...

— থামো! তুমি এদের বিধায়কের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছ।

— কী যে বলেন স্যার! আমার তাতে কী প্রফিট?

— আই ডোন্ট লাইক টু হিয়ার এনিথিং। গণ্ডগোল তুমি পাকিয়েছ, সমাধান তোমাকেই করতে হবে।

— আপনি খামোখা দোষ দিচ্ছেন স্যার। এসপির গর্জন গায়ে না মেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল বিশাল।

— শুনলাম মহাশয় রাজনীতির শখ রাখেন, বিরোধীপক্ষের সঙ্গে মিটিং করছেন ঘনঘন। লাভ হবে না মশাই। আমাদের দলে নাম লেখান, টিকিট পাইয়ে দেব উপরমহলে বলে-কয়ে। বিধায়ক কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করেনি বিশাল। কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে পিছন ফিরে বিনয়ের সঙ্গে বলল, নো থ্যাংকস! দানের কড়ি হজম করার

অভ্যেস আমার নেই। বেশ তো করে-কম্মে খাচ্ছেন, খান না। খামোখা প্রতিযোগী বাড়াতে চাইছেন কেন?

বিশালের কথাগুলো বিধায়কের কানে গরম সিসার মতো ঠেকলেও তিনি তেমন উচ্চবাচ্য করলেন না। রাগে ফেটে পড়লেন এসপি সাধন দত্ত। রীতিমতো শাসানির সুরে বিশালকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি চাই না তুমি আর-এক মুহূর্ত এখানে থাকো। গেট লস্ট ফ্রম হিয়ার।

— এ আপনার অন্যায় আবদার স্যার। বিপদের সময় আপনজনকে ছেড়ে চলে যেতে বলছেন। আমি তা পারব না।

— অতি বাড় বেড়েছে তোমার। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার আগে এখান থেকে চলে যাও, তা নাহলে...

— থামুন মশাই! তখন থেকে ভাট বকে যাচ্ছেন। আপনার পজিশনের সম্মানার্থে এতক্ষণ সব চুপচাপ সহ্য করে আসছি। কিন্তু আর নয়। এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না আমি। আপনার যা করার আছে করুন। পরক্ষণে একটু নরম হয়ে বলল, আজকের দিনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক আমি চাই না। অসহায় গরিব মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আসুননা আমরা হাতে হাত রেখে কাজ করি।

— তুমি কী করবে হে? তোমার মতো একজন সমাজ...

বিধায়কের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশাল সতেজে বলল, ইয়েস আমি একজন সমাজবিরোধী, ড্রাগসের কারবার করি। কিন্তু আপনাদের মতো সমাজসেবীর পোশাক পরে গরিব মানুষের হক মেরে ফুটুনি করি না।

— স্যার। স্যার। প্লিজ বিশালবাবু। পরিস্থিতি প্রতিকূলে প্রবাহিত হতে দেখে কাউন্সিলর উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলতে থাকলেন, দয়া করে এ নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না কেউ। বিশালবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, আজকের দিনে আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা উচিত।

চরণ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ফিরল। নৌকা তীরে ভিড়লে সে লাফ দিয়ে নেমে এল।

— গুরু এই নৌকায় চিঁড়ে, গুড় আর কলা আছে। আর একটা নৌকা আসছে ত্রিপল নিয়ে।

—গুড। মালগুলো সব স্কুলের বারান্দায় নিয়ে যেতে বল। তারপর বিলি করবি। হ্যারে চরণ পানীয়জলের ব্যবস্থা করতে পারিসনি?

— না গুরু। এদিকটা আমার মাথায় আসেনি। ত্রিপল খাটানোর জন্য বাঁশের দরকার, কৈলাশের বাঁশের আড়তে বলে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে বাঁশ চলে আসবে। কিন্তু পানীয় জলের...

চরণের শেষ বাক্যটি শোনার আগ্রহ দেখাল না বিশাল। বিধায়কের কাছে গিয়ে

অনুরোধের সুরে বলল, স্যার দয়া করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করুন।

— বিশালবাবু এদিকটা আমি দেখছি। আপনি ওদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করুন। বিধায়ককে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল কাউন্সিলর।

— থ্যাংকস আ লট। কাউন্সিলরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশাল এগিয়ে গেল স্কুলের বারান্দার দিকে। ততক্ষণে ছেলেরা ত্রাণসামগ্রীর অনেকটা নৌকা থেকে নামিয়ে এনে বারান্দায় জড়ো করেছে। চরণ কমবয়সি ছেলেমেয়েদের লাইনে দাঁড় করাতে শুরু করেছে। তারপর ডাকা হবে মহিলাদের।

বিশাল বারান্দায় উঠে সকলের উদ্দেশে গলার স্বর উঁচু করে বলতে থাকল, কেউ হুড়োহুড়ি করবে না। এক এক করে খাবার নিয়ে সুস্থভাবে খাওয়াদাওয়া করো। দুপুরে ভাতের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও দেখছি আমি। আর-একটি কথা ডাক্তার হাজরার নেতৃত্বে ক-জন চিকিৎসক আসছেন। কারও কোনো অসুবিধা থাকলে চেকআপ করে নিয়ো। ওষুধ পাবে বিনামূল্যে।

বারান্দা থেকে নেমে এল বিশাল। এসপিকে সঙ্গে নিয়ে বিধায়ক ততক্ষণে ভিড়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আসুন স্যার আপনার পবিত্র হাত দিয়ে পুণ্যকর্ম শুরু করুন। অন্তত কয়েকজনের হাতে খাদ্যদ্রব্য তুলে দিন।

— সরকারি ত্রাণের কী হবে? বিধায়ক জানতে চাইলে বিশাল বলল, সারা বাংলা বন্যাকবলিত। লাখ লাখ মানুষ পেটে খিদে নিয়ে হাহাকার করছে, কোথাও পাঠিয়ে দিন। বস্তির কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এরা সবাই আমার নিজের লোক, এদের জন্য আমি আছি।

বিধায়ক এসপির দিকে তাকালেন। এসপি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে তিনি এগিয়ে গেলেন। চরণ একবাটি চিঁড়ে হাতে নিয়ে প্রস্তুত ছিল। বাটিটা বিধায়কের হাতে তুলে দিল সে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

— মিস্টার অফিসার পৃথিবীতে কিছু মানুষ শুধু জিততে আসে। পক্ষান্তরে কিছু মানুষ আছে, যারা জিততে চেয়ে বারবার পরাজিত হয়। খুব তো কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, কী লাভ হল শুনি? অযথা ভরা আদালতে বিচারকের ধমক খেলেন।

আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসপি সাধন দত্তের মুখোমুখি হয়ে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল বিশাল।

— ইউ। প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে এসপি বললেন, আই উইল সি ইউ। মনে রেখো এক মাঘে শীত যায় না।

বহরমপুর, লালগোলা, জলঙ্গী, রঘুনাথগঞ্জ, তথা মুর্শিদাবাদ জেলার কমবেশি সব থানায় বিশালের নামে একাধিক কেস নথিবদ্ধ আছে। কোনো কেস আজ অবধি আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি। কোথাও টাকা দিয়ে তো কোথাও ভীতি প্রদর্শন করে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এসপি সাধন দত্তের সৌজন্যে এই প্রথম তাকে কাঠগড়ায় উঠতে হল।

ল্যাংচা খুনের কেসটা নিয়ে এসপি প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন। চুপচাপ ছিল না বিশালও। খুনের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী নয়নতারা। তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করছে কেসের ফয়সালা। প্রথম থেকে মেয়েটাকে নিজের কবজায় রেখেছিল বিশাল। সরকারি উকিল কী কী প্রশ্ন করতে পারেন, কী উত্তর দিতে হবে, কীভাবে দিতে হবে, ইত্যাদি বিষয়গুলি একজন দক্ষ আইনজীবীর তত্ত্বাবধানে রেখে নয়নতারাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নিরাশ করেনি সে। এতটুকু বিচলিত না হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সরকারি উকিলের মোকাবেলা করে গেল।

— তোমার নাম নয়ন?

আজ ছিল রায়দান পর্ব। বিচারক পুলিশকে তদন্তে আরও যত্নবান হবার পরামর্শ দিয়ে বিশালদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

রাতের দিকে চরণ নয়নতারাকে গোপন আস্তানা থেকে বাংলোয় নিয়ে এলে বিশাল জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে তোমার কে কে আছে নয়ন?

— বাবু আমি আদতে ওপার বাংলার মেয়ে। স্কুলে পড়তে পড়তে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়। সে বলেছিল তার বাড়ির লোক এই সম্পর্ক মেনে নিতে চাইছে না, চলো পালাই। একদিন তার কথা শুনে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছাড়লাম। তখন কি আর জানতাম শয়তানটা আমাকে দালালের কাছে বেচে দেবে? এহাত-ওহাত করে ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই শহরে এসে পৌঁছেছি।

— যা হবার হয়ে গেছে। সব ভুলে তুমি ওপারে চলে যাও। তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। এমন কী আর বয়স হয়েছে তোমার। ওখানে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করো। এই নোংরা পথে পড়ে থেকে জীবন নষ্ট কোরো না।

— বাবু আপনি মানুষ নয় দেবতা। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে ভালো হবার কথা বলেনি। সবাই লুটেপুটে খেয়েছে। আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি যাব ওপারে। নয়নতারা কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে থাকল, জানি বাড়িতে আমাকে নেবে না, তবুও ফিরে যাব দেশে। লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করব, এঁটোকাটা খেয়ে থাকব সেও ভালো।

একতাড়া নোট নয়নতারার হাতে দিয়ে বিশাল বলল, আপাতত যেখানে আছ সেখানেই থাকো। লাইন ক্লিয়ার হলে পরে চরণ তোমাকে বর্ডার পার করে দিয়ে আসবে।

মৃত মায়ের একখানা ছবি বাংলোয় বসার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে বিশাল। চেয়ারে বসে মাথা তুললেই ছবিখানা চোখে পড়ে। বিশাল ছবির সামনে এসে দাঁড়াল।

মনে মনে বলল, আশীর্বাদ করো আমার সন্তান যেন আমার মতো না হয়। ভগবানকে বলো তার বিধিলিপিতে যেন খারাপ কিছু না লেখেন।

পায়ের শব্দে চেতনা ফিরে পেয়ে দেখে চরণ ঢুকেছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছে মুছতে বলল, চরণ আমাকে বাসায় রেখে আয়। ঝুমা একা আছে, এইসময় ওকে একা রাখা ঠিক হবে না।

— এইসময় মানে! কী হয়েছে ঝুমার?

পিছন ফিরে চরণের দিকে মুখ করে মৃদু হেসে বলল, তোকে একটা সুসংবাদ দেওয়া হয়নি রে। তুই কাকু হবি।

— অ্যাঁ! এ তো বড়ো আনন্দের খবর, পার্টি দিতে হবে গুরু।

— হবে'খন।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গটগট করে হেঁটে বারান্দায় চলে এল বিশাল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

— গুরু ডা. মজুমদারের চেম্বারে...

চরণ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কিছু বলতে গেলে মাঝপথে বাধা দিয়ে বিশাল জিজ্ঞাসা করল, তোর আবার কী হল? কেন সেখানে গিয়েছিলি?

— না না! আমার কিছু হয়নি। হরিশ তার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় দেখা হতে ডাকল।

— তারপর?

— সেখানে গিয়ে একটি মেয়েকে নাম লেখাতে দেখলাম। ঠিকানা বলল উধমপুর। বিদিশা নামটা শোনা ছিল, আলাপ করে নিশ্চিত হলাম সে কৈলাসবাবুর মেয়ে।

— ইজ ইট! আর ইউ সিয়োর?

— হানড্রেড পারসেন্ট।

— হরিশ কি এখনও ডাক্তারের চেম্বারে আছে?

— থাকার কথা। আমি ওকে পৌঁছে দিয়েই চলে এসেছি।

— হরিশকে ফোন লাগা। মেয়েটি এখনও সেখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা কর।

চরণ পকেট থেকে মোবাইল বার করে হরিশকে ধরল। চটপট কথা শেষ করে নিয়ে বিশালকে জানাল, গুরু এখনও আছে মেয়েটি সেখানে।

— গুড! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুই সেখানে যা। মেয়েটিকে কিডন্যাপ করে সোজা কুঠিবাড়ি তোল। সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা হবে।

পঞ্চাননতলার মোড় থেকে জলঙ্গীর দিকে যাবার পথে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরত্বে, ডানদিকে একটি ছোটো রাস্তা গিয়েছে। ওই রাস্তা ধরে কিছুটা গিয়ে মাঠের মধ্যে কুঠিবাড়ি। আশেপাশে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে জনবসতি নেই। ব্রিটিশ আমলে এক সাহেব কুঠি নির্মাণ করে এলাকার চাষিদের দিয়ে নীলচাষ করাতেন। কৃষক আন্দোলনে নাস্তানাবুদ হয়ে ব্যাবসাপত্র গুটিয়ে সাহেব কলকাতা পালিয়েছিলেন। সেই থেকে কুঠিবাড়ি বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে। অভিশপ্ত জায়গা অপবাদ থাকায় এলাকার মানুষ কুঠিবাড়ির ত্রিসীমানায় যায় না। অযত্ন-অবহেলায় তার ভগ্নদশা, আগাছার জঙ্গল যত্ন করে ঘিরে রেখেছে।

আস্তানাটি চরণের আবিষ্কার। বছরকয়েক আগে ওই পথ ধরে যাবার সময় পেট খালি করার প্রয়োজন বোধ করে। মাঠে লোকজন থাকায় গাছগাছালির আড়ালে কাজ সারতে ঢুকে পড়েছিল। কাজ শেষে পোড়োবাড়ি ঘুরে দেখতে গিয়ে চোরাপথের সন্ধান পায়। সেই পথ ধরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার অতলগহ্বরে।

বাংলোয় ফিরে চরণ কুঠিবাড়ির কথা বলেছিল বিশালকে। এইরকম একটি নিরিবিলি গোপন স্থানে আস্তানা গাড়তে পারলে ভালো হয়, বিশেষ করে আমদানিকৃত মাল লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে সুবিধা হয়। পুলিশও সহজে আন্দাজ করতে পারবে না, ইত্যাদি সাত-পাঁচ কথা ভেবে একদিন ওরা কুঠিবাড়ি পরিদর্শনে গিয়েছিল। টর্চের আলো ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখে আট বাই দশ মাপের দু-টো রুম রয়েছে পাশাপাশি।

জায়গাটি পছন্দ হয় বিশালের। দুজনে মিলে ঘরটিকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে। দরজায় কিছু কাজ করার ছিল। বাইরে থেকে মিস্ত্রি এনে কাজ করায়। যদিও সবসময় ঘরটি ব্যবহার করা হয় না। অতিরিক্ত মাল আমদানি হলে কিংবা পুলিশি ঝামেলার সম্ভাবনা থাকলে তবে এখানে মাল লুকিয়ে রাখে। সুযোগ বুঝে আবার সেখান থেকে ডেসপ্যাচ করে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হতে বিশাল কুঠিবাড়িতে এল। হরিশ বাইরে বসে বিড়ি টানছিল। বিশালকে দেখে বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিশাল জানতে চাইল, চরণ কোথায়?

— ওদের জন্য খাবার আনতে গেছে।

— ওদের মানে! আর কে আছে?

— আজ্ঞে মেয়েটির সঙ্গে তার বয়ফ্রেণ্ডও আছে।

— হুম্! দরজা খোলো।

বসের নির্দেশ পেয়ে তালা খুলে পাল্লা টেনে ধরল হরিশ। ভিতরে প্রবেশ করল বিশাল। এক কোণে একটি মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছে। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে একটি ছেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। এই তবে কৈলাসপ্রসাদ রায়ের মেয়ে বিদিশা!

— বিদিশা। অপরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল মেয়েটি। পরক্ষণে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল, আপনি এদের বস?

বিশাল কোনো উত্তর দিল না। তখন মেয়েটি পুনরায় বলল, কেন আমাদের আটকে রাখা হয়েছে?

— ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে।

— শুনুন, জানার আমার কিছুই বাকি নেই। আপনার কী অভিপ্রায় তা আমি ওই লোকটার মুখে সব শুনেছি। দেরি করছেন কেন? আসুন ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তারপর একে একে আসুক আপনার ছেলেরা। একথা বলে বিদিশা পটপট করে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল।

— স্টপ! স্টপ দিস। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল বিশাল। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল হরিশ। সজোরে তার তলপেটে লাথি মেরে বলল, স্কাউনড্রেল! নোংরামি করার জন্য তোমাকে এখানে রাখা হয়নি। ফের যদি শুনি তুমি ওদের সঙ্গে বাঁদরামি করেছ লাশ ফেলে দেব।

হরিশ তলপেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, সরি স্যার! ভুল হয়েছে। আর কখনও এমন হবে না।

— না হলেই তোমার মঙ্গল। অতঃপর বিশাল পুনরায় বিদিশার দিকে ঘুরে বলল, সরি বিদিশা। নোংরামি করার জন্য তোমাকে এখানে তুলে আনা হয়নি। তোমাকে কবজায় রেখে তোমার বাবার কাছ থেকে...

— কত টাকা দিতে হবে বলুন? দশ লাখ, বিশ লাখ? পলাশদাকে ছেড়ে দিন। আপনি যত টাকা চাইবেন পলাশদা বাবার কাছ থেকে এনে দেবে।

— ইজ ইট?

— হ্যাঁ স্যার। আমাকে যেতে দিন। এই প্রথম কথা বলল পলাশ।

— বেশ তবে তাই হোক। এসো পলাশবাবু আমার সঙ্গে। একথা বলে বিশাল ঘর থেকে বের হতে গেলে বিদিশা বলল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে।

— পাশের ঘরে। লেনদেনের ব্যাপারটা একটু আলোচনা করে নিই। এসো পলাশ।

ঘর থেকে বেরিয়েই চরণের মুখোমুখি হল বিশাল। খাবার নিয়ে তখনই ফিরেছে সে। বিশালকে দেখে বলল, গুরু তুমি কতক্ষণ?

— মিনিট বিশেক হল। খাবার এনেছিস?

চরণ খাবারের প্যাকেট দেখালে বিশাল পুনরায় বলল, একটা প্যাকেট বিদিশাকে দিয়ে পলাশেরটা তুলে রাখ। পরে খাবে ও।

পলাশকে নিয়ে পাশের ঘরে গেল বিশাল। সেখানেও একটি মোমবাতি জ্বলছে। এখানে বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। একপাশে জড়ো করা আছে কয়েকটি মালভরতি কাগজের কার্টন। একটা টেনে নিয়ে পলাশকে বসতে বলে আর একটি টেনে নিয়ে নিজে বসল। তৃতীয়টিকে মাঝখানে রাখল। সেটা টেবিলের কাজ করবে। ততক্ষণে চরণ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশাল তাকে সাদা কাগজ আনতে বললে সে পুনরায় বেরিয়ে গেল।

পলাশ তখনও দাঁড়িয়ে। বিশাল তাকে বসতে ইশারা করল। সে বসলে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কোনো দুশমনি নেই। তোমাকে তুলতেও চাইনি। ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়েছ। এনিওয়ে তোমাকে পেয়ে আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

— বলুন।

— বিদিশাকে খুব ভালোবাসো?

— হ্যাঁ! ওর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।

— গুড! আপাতত...

চরণ একটা কাগজ নিয়ে ফিরল। বিশাল তার হাত থেকে কাগজের টুকরোটি নিয়ে মাঝের কার্টনের উপর রাখল। তারপর পকেট থেকে কলম নিয়ে পলাশের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, আমি যা বলব তা এই কাগজে লিখে সই করে দাও।

কলম নিতে ইতস্তত করতে থাকে পলাশ। বিশাল তখন ধমক দিয়ে বলল, আমাকে খারাপ কিছু করতে বাধ্য কোরো না প্লিজ। কলম ধরো।

— স্যার বলছি...

পলাশকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে বিশাল হাঁক পাড়ল, চরণ।

— বলো গুরু।

— ও ঘরে যা। আমি যতবার ইয়েস বলব বিদিশার ততগুলো আঙুল কেটে ফেলবি। তাতেও কাজ না হলে ব্লেড দিয়ে চিরে ফালাফালা করে দে ওর গোটা শরীর। যা।

চরণ ওঘরের দিকে পা বাড়ালে পলাশ কলম তুলে নিয়ে বলল, বলুন স্যার কী লিখতে হবে।

— দ্যাটস লাইক আ গুড বয়। লেখো...

পরম পূজনীয় কৈলাসজেঠু। প্রণাম নেবেন। আমার পরবর্তী কথাগুলো আপনার ভালো লাগবে না জেনেও লিখতে বাধ্য হচ্ছি। কী করব বলুন? যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বিদিশার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছি। — কী হল লিখছ না কেন?

— স্যার আমি...

পলাশের কথা শুনে চরণ থেমে গিয়েছিল। বিশাল তাকে ধমক দিল, গাণ্ডু তোকে কে এখানে দাঁড়াতে বলেছে। বিদিশার কাছে যা।

চরণ সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। তখন বিশাল পলাশকে বলল, লেখো যে উদ্দেশ্যে...। আগে বলা বাক্যটি রিপিট করল বিশাল। তারপর আর ব্যাগরা দিল না পলাশ। বিশাল বলল আর সে নীরবে লিখে গেল—

শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি, আমি কোনোদিন বিদিশাকে ভালোবাসিনি, এখনও না, ভবিষ্যতে কোনোদিন ভালোবাসতে পারব না। আমার টার্গেট আপনার সম্পত্তি। বিদিশাকে বিয়ে করলে সেই সম্পত্তির ক্ষুদ্র অংশ আমার হাতে আসবে, যা নিয়ে আমি কোনোদিন সন্তুষ্ট হতে পারব না। তাই আমি আপনার মেয়েকে কিডন্যাপ করেছি। যদি মেয়েকে জীবিত ফেরত পেতে চান তাহলে আগামীকাল রাত এগারোটার পরে খাগড়া স্টেশন সংলগ্ন শিবমন্দিরের পিছনে দু-কোটি টাকা রেখে আসবেন। আর সেই কাজটি করবেন আপনি নিজে। সাবধান! কোনোরকম চালাকি করতে যাবেন না। মাইন্ড ইট। এতটুকু বেচাল দেখলে আমি কিন্তু বিদিশাকে মেরে, টুকরো টুকরো করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। ইতি আপনার স্নেহধন্য পলাশ বাঁড়ুজ্জ্যে।

চিঠির নীচে সই করে হু হু করে কেঁদে ফেলল পলাশ। বিশাল কাগজ-কলম কেড়ে নিয়ে বলল, এই চিঠির কথা বিদিশা জানবে না কেমন। জানলে তোমাদের দুটোকেই...। কথা শেষ না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বিশাল।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে চিঠি কেন? পলাশকে দিয়ে ফোন করালে কিংবা তার মোবাইল থেকে কৈলাসবাবুর হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাতে পারত। বিশাল তা করল না কারণ, পুলিশ লোকেশন ট্র্যাক করে সহজেই গোপন আস্তানায় পৌঁছে যাবে। তাছাড়া সে তো আর সত্যি সত্যি সম্পত্তির প্রত্যাশী নয়, নানাভাবে বিব্রত করে কৈলাসবাবুকে মানসিক পীড়া দেওয়াই তার মুল উদ্দেশ্য।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশেষ কাজ নিয়ে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল, বাড়ি ফিরল তখন বেলা প্রায় বারোটা। ঝুমা আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় শরীর বিছিয়ে দিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে। বিষয়

যাই হোক পড়ায় সে এতটাই নিমগ্ন যে, বিশালের উপস্থিতি টের পায়নি। আলনার কাছে গিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে সাড়া দিল পড়ছ, কী সাবজক্ট, শিশুর স্বাস্থ্যচর্চা নাকি হেঁসেলের গল্প?

— তুমি কখন এলে? ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্বামীর দিকে দৃষ্টি ফেরাল ঝুমা।

— জাস্ট মিনিট কয়েক।

— যাবার সময় বলে গেলে ফিরতে বিকেল হবে। দুপুর হতে না হতে ফিরে এলে যে?

— কাজ হয়ে গেল।

— আজকাল তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি ফিরছ। ম্যাগাজিনটা রেখে দিয়ে সোজা হয়ে বসল ঝুমা। তারপর পেটে হাত দিয়ে বলল, কার আকর্ষণে, আমার না এর?

ছাড়া শার্ট-প্যান্ট আলনায় গুছিয়ে রেখে খাটের কাছে এসে বলল, আকর্ষণ কোনোটার কম নয়। তবে ও যতদিন না আসছে এটার উপর...। আচমকা স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু করল বিশাল।

— অ্যাই হচ্ছেটা কী? ছাড়ো বলছি।

— উঁহু!

— তবে রে বেহায়া পুরুষ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। অ্যাই কলি এদিকে শুনে যা।

কলি কিচেন থেকে সাড়া দিল, আসছি বউদি। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল বিশাল। ততক্ষণে কলি এসে দাঁড়িয়েছে। ঝুমা তাকে বলল, রান্না কতদূর? দাদাবাবুকে খেতে দিতে হবে।

— চাটনিটা হয়ে গেলেই দেব বউদি।

— বেশ। তাড়াতাড়ি কর।

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ঘর ছেড়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ পিছন ঘুরে কলি বলল, জানেন দাদাবাবু বউদি আজ বাথরুমে পড়ে গেছিল।

— এই তোকে পাকামো করতে হবে না। কাজ করগে যা। ঝুমা কলিকে বকা দিলে সে পালাল।

— কলি যা বলে গেল তা কি সত্যি? আঁতকে উঠে বিশাল স্ত্রীর দিকে তাকালে ঝুমা বলল, তেমন কিছু নয়।

— তেমন কিছু নয় মানে? এই অবস্থায় তোমার পেটে সামান্য চোট লাগা থেকে কত বড়ো বিঘ্ন ঘটতে পারে জানো? কখনকার ঘটনা?

— ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়েছিলাম। কখন শাড়ির কোচা খুলে গেছে খেয়াল করিনি। পায়ে জড়িয়ে যেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

— আমি বেরিয়ে যাবার পর তুমি আবার শুয়েছিলে?

— হুঁ।

— কেন? তোমার তো বেশি বেলা করে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই।

— কী জানি কেন খুব ঘুম পাচ্ছিল। শরীরে জোর পাচ্ছিলাম না।

উঠে দাঁড়াল বিশাল। তারপর বলল, আমি চট করে ফ্রেশ হয়ে আসছি। কলিকে টেবিলে খাবার দিতে বলো। তুমিও খেয়ে নাও, খেয়েদেয়ে ডাক্তারের কাছে যাব।

— তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।

— ব্যস্ত হব না মানে?

— ওরে পাগলা, ডাক্তার দেখানো হয়ে গেছে। থামল ঝুমা। তারপর আরও বলল, পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কলি আর হরিশে মিল আমাকে ডা. মজুমদারের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিল।

— কী বললেন তিনি?

— বিপদ হতে পারত। লাকিলি বেঁচে গেছি।

— এত কাণ্ড ঘটে গেছে অথচ আমাকে কিছু জানাওনি। ইচ্ছা করছে গালে দুটো চড় মারি।

— থাক আর বাহাদুরি করতে হবে না তোমাকে। যেখানে যাচ্ছ যাও। ঝুমা ম্যাগাজিনটা পুনরায় হাতে নিয়ে বিছানায় শরীর বিছিয়ে দিল। বিশাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টুকটুক করে বাথরুমের দিকে হেঁটে চলল।

খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল বিশাল। মোবাইল ফোন বেজে উঠতে তন্দ্রা ছুটে গেল। হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা নিয়ে স্ক্রিনে দৃকপাত করে ধড়মড় করে উঠে বসল। উধমপুর থেকে লিয়াকত কল করেছে। কল রিসিভ করে দ্রুত সাড়া দিল, বল লিয়াকত।

— স্যার কারা যেন বেণী কেটে ফেলেছে।

— তারপর?

— পুলিশ বিদেশবাবুকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।

— হুম!

— আর-একটি সংবাদ আছে স্যার।

— দিয়ে ফেল।

— কৈলাসবাবুর মেয়ে বিদিশাকে পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল সে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সদরে গিয়েছিল। এখনও ফেরেনি।

— সেটা কৈলাসবাবুর সমস্যা, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আর কিছু?

— না স্যার।

— ওখানে তোমার আর কোনো কাজ নেই।

— ওকে স্যার। আমি এখনই ফেরার গাড়ি ধরছি।

একথার উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করল না বিশাল। রেড বোতামে চাপ দিয়ে লাইন কেটে দিল। তারপর কৈলাসবাবুর নম্বর ডায়াল করল। বার তিনেক বাজার পর একজন মহিলা হ্যালো করলে বিশাল বলল, কৈলাসপ্রসাদ প্লিজ।

— উনি এখন ব্যস্ত আছেন। পরে ফোন করুন।

— ছেলে খুনের দায়ে ধরা পড়েছে, মেয়ে লাপাতা। বুড়ো বয়সে আর কত সামলাবেন উনি। ওঁকে ফোন দিন, এইসব ব্যাপারেই কিছু ইনফরমেশন দেবার আছে।

কয়েক মিনিট বাদে ওপার থেকে কৈলাসবাবুর কাতর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে বলছেন? বেণী খুনের ব্যাপারে আপনার কী জানা আছে প্লিজ বলুন আমাকে।

— এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লে চলবে কৈলাসবাবু? আপনার শিরদাঁড়া ইস্পাতের মতো কঠিন, সহজে কাবু হওয়ার লোক নন ইত্যাদি কত কথাই না সেদিন শোনালেন আমাকে। আর এটুকুতেই...। যাকগে যা বলছিলাম, বিদেশবাবু কিন্তু কাজটা ভালো করেননি। মালিক হয়ে ইউনিয়ন লিডারের স্ত্রীর সঙ্গে পরকিয়া? ছি ছি!

— বাজে কথা, মিথ্যে রটনা সব। কেউ ষড়যন্ত্র করে এসব কথা রটিয়েছে।

— শুনলাম আপনার মেয়েকেও পাওয়া যাচ্ছে না। সেটাও কি রটনা কৈলাসবাবু?

— কে আপনি? এত কথা আপনি জানলেন কীভাবে?

— আমি কে জেনে আপনার ফায়দা নেই। আসল কথা শুনুন, এইসব ঘটনার মাস্টার মাইন্ড হল পলাশ।

— পলাশ!

— আপনার মেয়ের বয়ফ্রেন্ড! বেণীবাবুর স্ত্রীকে জড়িয়ে বিদেশবাবুর নামে রটনা সে-ই ছড়িয়েছে বাজারে। খুনটাও তার কীর্তি। সে-ই বিদিশাকে আটকে রেখেছে।

— পলাশের সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে আমার মত নেই ঠিকই। কিন্তু ও এমন কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।

— বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। ফোন কেটে দিল বিশাল।

উধমপুরের সংবাদ পাবার পর বিশাল আর বাসায় তিষ্ঠোতে পারল না। শার্ট-প্যান্ট পরে বাংলোয় চলে এল। ওকে দেখেই চরণ বলল, গুরু একটা খারাপ খবর আছে।

কোনো কথা বলল না বিশাল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তখন চরণ আবারও বলল, মেয়েটাকে কুঠিবাড়ি থেকে সরাতে হবে।

— কেন?

— কৈলাসবাবু মিসিং ডায়ারি করেছেন। এসপি নিজে কেসটা ডিল করছেন।

— তুই জানলি কী করে?

— তোমাকে না পেয়ে গোলদারবাবু আমাকে কল করেছিলেন। কে যেন ফোন করে কৈলাসবাবুকে বলেছে পলাশ বিদিশাকে কিডন্যাপ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না বিশাল। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। চরণের বুঝতে বাকি রইল না বিশাল গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাই সেও চুপ করে থাকল। অনেকক্ষণ বাদে সিগারেটের পোড়া অংশ অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বিশাল বলল, একটি নিরাপদ আস্তানার খোঁজ দিতে পারিস যেখানে বিদিশাকে রাখলে কেউ জানতে পারবে না?

— আছে গুরু। তোমার অনুমতি পেলে মেয়েটাকে ওখানে রেখে আসতে পারি।

— কোথায় সেটা?

— পদ্মার চরে মরিচা একটা নতুন ঘর দিয়েছে। ঘর বলতে বাঁশের খাঁচার উপর টিনের দেওয়াল, টিনের ছাউনি দেওয়া। আসলে এখনও সেখানে বসতি গড়ে ওঠেনি, অত বড়ো চরে মাত্র দু-চারখান ঘর। ওই যারা বাংলাদেশে মাল পাচার করে বা ওদিক থেকে আমদানি করে, তারাই পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে ওখানে আস্তানা গেড়েছে। লোকচক্ষুর আড়ালে নিরিবিলি প্লেস, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।

মরিচা দলেরই ছেলে। লালগোলা এলাকায় ওর হাত দিয়েই মাল ডেলিভারি হয়ে থাকে। বিশাল তাকে চোখে দেখেনি। চরণের আবিষ্কার, সে-ই ওর কাছে মাল পৌঁছে দিয়ে আসে, পেমেন্ট নিয়ে আসে। আজ পর্যন্ত তাকে নিয়ে কোনো অশান্তির রেকর্ড নেই।

— মরিচার উপর কতটুকু ভরসা করা যায়? চরণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জানতে চাইল বিশাল।

— আমার কথার বাইরে ওর কিছু করার সাহস নেই।

— তাহলে বিদিশাকে ওখানেই রেখে আয়।

— ছেলেটা?

— আপাতত ও এখানেই থাকুক। তাকে আমার প্রয়োজন আছে।

চরণ কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিশাল আর-একটি সিগারেট বার করে আগুন ধরাতে উদ্যত হল। এমন সময় মোবাইলে মেসেজ ঢোকার শব্দ হল। ইনবক্সে গিয়ে মেসেজটা খুলে নড়েচড়ে বসল বিশাল। অজানা একটি নম্বর থেকে প্রেরিত মেসেজটি 'ডিয়ার বিশালবাবু' শব্দযুগল দিয়ে শুরু হয়েছে দেখে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়তে শুরু করল বিশাল।

— কৈলাসবাবুর মেয়ে বিদিশা ও তার বয়ফ্রেন্ডকে আপনি কিডন্যাপ করে কুঠিবাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। তারপর বেণীবাবুকে আপনিই খুন করিয়েছেন।

বেণীবাবুর স্ত্রীকে জড়িয়ে বিদেশবাবুর নামে কুৎসা রটনা আপনারই কাজ। তাছাড়াও সোমনাথ, ল্যাংচাকে মেরে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রমাণও আমার কাছে আছে। এখন যদি আমি সব প্রমাণপত্র এসপি সাধন দত্তের হাতে তুলে দিই, আপনার হাল কী হবে একবার ভেবে দেখেছেন? তাই বলছিলাম ভালো চানতো আজ রাত একটার সময় ত্রিশ লাখ টাকা চটের বস্তায় ভরে লালবাগ স্টেশনের পাশে নবাব সরফরাজ খানের মাজারের কাছে রেখে আসুন। তা নাহলে...।

বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে মেসেজটি শেষ করা হয়েছে। বার দুই মনোযোগ সহকারে মেসেজটি পড়ল বিশাল। তারপর চোয়াল শক্ত করে মনে মনে বলল, শুয়োরের বাচ্চা তোকে একবার হাতের মুঠোয় পাই, ওই নবাবের কবরেই জ্যান্ত গেড়ে দেব।

অতঃপর মেসেজ অপশন থেকে বেরিয়ে কনটাক্ট লিস্টে গিয়ে গোলদারবাবুর নম্বরে কল দিল। কল রিসিভ হলে মেসেজ প্রেরক নম্বরটি দিয়ে বলল, এই নম্বরটি কার এবং কোত্থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে খোঁজ নিন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট চাই আমার।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত একটু গভীর হতে চরণকে সঙ্গে নিয়ে কুঠিবাড়িতে এল বিশাল। হরিশের জায়গায় আফজল আর মুন্না ডিউটিতে রয়েছে। বসকে দেখে তারা নড়চড়ে বসল।

— এনি প্রবলেম? বিশাল জিজ্ঞাসা করলে আফজল বলল, স্যার মেয়েটি খুব ঝামেলা করছে। খাচ্ছে না কিছু।

— মুক্ত বিহঙ্গ হঠাৎ খাঁচায় আটকা পড়েছে, একটু ছটফট করবেই। দরজা খোল।

মুন্নার কাছে চাবি ছিল। তালা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। বিশাল ঘরে প্রবেশ করল, পিছন পিছন চরণও।

— আর কতদিন এখানে থাকতে হবে আমাদের?

বিদিশার জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশাল বলল, কিছুক্ষণ বাদে তোমাকে নতুন ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

— পলাশদা?

— ওকে ছেড়ে দেব আমি। বাড়ি গিয়ে সে আমার হয়ে একটা কাজ করতে বলবেন কৈলাসবাবুকে। কাজটা হয়ে গেলে তোমারও ছুটি।

— বাবা যদি তা না করেন?

— না করার সাহস তার নেই। তোমার জন্যই তিনি আমার কাজ করে দেবেন। এনিওয়ে তোমার জন্য একটা খারাপ খবর আছে।

বিদিশা গর্জন করে তাকাল। গায়ে না মেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বিশাল বলল, তোমার দাদা ইউনিয়ন লিডার বেণীবাবুকে খুন করেছে।

— হোয়াট? দাদা খুন করেছে। না না। এ হতেই পারে না।

— তুমি মানো আর না-মানো এটাই সত্যি বিদিশা। খুনের দায়ে সে এখন পুলিশ কাস্টডিতে।

— বিদেশদা খুন করেছেন একথা আমিও বিশ্বাস করি না। কেন তিনি বেণীবাবুকে খুন করবেন? বলল পলাশ।

— তার জন্য তুমিই দায়ী হে ছোকরা।

— আমি! কী করেছি আমি?

— বেণীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে, তুমিই নাকি এমন কথা বাজারে ছড়িয়েছ। তার জেরেই এই খুন।

একথা শুনে বিদিশা প্রেমিকের দিকে তাকালে সে তড়িতাহতের মতো আতঙ্কিত হয়ে উঠে বলল, বাজে কথা। বিশ্বাস করো বিদিশা আমি এসবের কিচ্ছু জানি না। কেউ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এমন কথা রটিয়েছে। তারপর বেপরোয়া হয়ে উঠে বিশালের জামার কলার চেপে ধরে পলাশ চিৎকার করে উঠল, ইউ ব্লাডি বিচ। এসব তোমার ষড়যন্ত্র। আমার আর বিদিশার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য তুমিই এই কাজ করেছ। আই কিল ইউ বাস্টার্ড।

পলাশকে বেয়াদবি করতে দেখে চরণ-আফজলরা অস্ত্র বাগিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে বিশাল তাদের নিরস্ত্র করে বলল, কেউ ওর গায়ে হাত দিবি না। বাইরে যা তোরা।

এমন সময় বিশালের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। পকেট থেকে ফোন বার করে দেখল গোলদারবাবু। কল রিসিভ করলে তিনি জানালেন, তার দেওয়া ফোন নম্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই।

— হাউ পসিবল? একটা নম্বর থেকে মেসেজ এল অথচ তার অস্তিত্ব নেই?

— এমন কতকিছুই তো আজকাল ঘটছে বিশালবাবু। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে অথচ জানা যাচ্ছে না সেই টাকা কোন অ্যাকাউন্টে গেল। একজনের ধড়ে অন্যজনের মাথা বসিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা আদায় করা হচ্ছে। ডিজিটাল করিশ্মা মশাই। না জানি এজন্মে আর কত কী দেখব।

আর কথা বাড়াল না বিশাল। ফোন রেখে দিল। ততক্ষণে চরণরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বিশাল ঘর ছাড়তে উদ্যত হলে বিদিশা বলল, পলাশদাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

— যাব না বললে শুনছে কে সিস্টার? যেতে তোমাকে হবেই।

— সিস্টার! আপনি আমাকে বোন ডাকলেন?

ততক্ষণে বিশাল তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না না। ভুল শুনেছ তুমি। আমি তোমাকে বোন বলব কেন?

— এবার বুঝতে পারছি সেদিন কেন ওই ছেলেটাকে লাথি মেরেছিলেন।

বিশাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদিশার পানে তাকল। সে বলতে থাকল, লতাপাতায় আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে। তাই ছেলেটা খারাপ কথা বলায় আপনি রেগে গিয়েছিলেন।

— স্টপ দিস। স্টপ দিস। বাজে বোকো না। কী শুনতে কী শুনেছ তাই নিয়ে...

বিশালের কথার মাঝে পলাশ বলল, স্যার বিদিশা ঠিক বলছে। আপনি সিস্টার-ই বলেছেন।

— শাটআপ ননসেন্স। সপাটে পলাশের গালে চড় বসিয়ে দিয়ে বিশাল দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

পাশের ঘরে ঢুকে চরণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, বিদিশাকে কীভাবে লালগোলা নিয়ে যাবি কিছু ভেবেছিস?

— কেশবকে বলে রেখেছি। রাত বারোটার পর ও ট্যাক্সি নিয়ে এখানে আসবে।

— কেশব। স্টেশন রোডের সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটা?

— হ্যাঁ গুরু।

— ওর সঙ্গে তোর কথা হয়েছে?

— গোলদারবাবু ফোন পাবার পর ওর সঙ্গে কনটাক্ট করেছিলাম। যাবে বলেছে ও।

— বাইরের ছেলে নিয়ে কাজ করবি, শেষে সবকিছু জানাজানি হয়ে যাবে নাতো?

— আমাকে অতটা কাঁচা ভাবছ কেন গুরু।

— দেখ সব কিছু ঠিকঠাক হলে আমার আপত্তি নেই। একটু থেমে আবার বলল, তোকে লালগোলা যেতে হবে না, আফজল আর মুন্না যাক।

— তা কী করে সম্ভব? মরিচা ওদের চেনে না। তাছাড়া রাস্তাঘাট চেনার ব্যাপার আছে।

— হুম্। উঠে দাঁড়াল বিশাল। তারপর বলল, তোরা সবাই চলে গেলে পলাশকে কে দেখবে?

— এদিকটা তো ভাবিনি গুরু।

— হরিশ-লিয়াকতদের এখানে ডেকে নে। ওরা পলাশের কাছে থাক। তারপর

দরজার দিকে দু-কদম এগিয়ে এসে পিছন ঘুরে বলল, আমি না বলা পর্যন্ত তোরা এখান থেকে বের হবি না কেমন।

উত্তরের প্রত্যাশা না করে হনহন করে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠে বসল বিশাল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখল, দশটা ছেচল্লিশ মিনিট। অতঃপর মোবাইলটা পূর্বস্থানে রেখে দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল শহর অভিমুখে।

স্টিয়ারিঙে হাত, দৃষ্টি সামনের দিকে থাকলেও বিশালের মাথায় অন্য ভাবনা খেলা করছে। বিদিশাকে মরিচার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য চরণ এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কেন? সর্বোপরি তার সঙ্গে আলোচনা না করেই কেন সে কেশবকে নির্বাচন করল? তবে কি সে গেম খেলছে?

অবিনাশ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে গেল বিশালের। বুড়োটা একদিন তাকে চক্ষুদান করেছিল। সুযোগ বুঝে তাঁকে গদিচ্যুত করে মসনদ জবরদখল করেছে সে। তার বেলায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার হবে যদি সেই কাজ করে চরণ! সে শুধু বাল্যবন্ধু নয়, ভাইয়ের মতো আপন।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মন আঙিনায় পরপর সাজিয়ে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণের চেষ্টা করল। তারপর চরণ, লিয়াকত-সহ ঘনিষ্ঠ সকলকে ছায়াচিত্রের কুশীলব বানিয়ে মহড়া শুরু করল। এমনকি ঝুমাকে পর্যন্ত বাজিয়ে দেখল। একে একে সবাই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। শুধু চরণের বেলায় বারবার হোঁচট খেতে হল। পাশ করা তো দূরের গল্প, ওকে নিয়ে যত ঘাঁটাঘাঁটি করছে ততই জটিলতা বেড়ে চলেছে।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

পেটে সন্তান আসার পর ঝুমাকে নতুন বাতিক পেয়ে বসেছে। হাতে কাজ না থাকলে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটায়। বেছে বেছে পছন্দের টপিকগুলো মন দিয়ে পড়ে। কখনও কখনও গুগল অ্যাপে গিয়ে প্রসূতি-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শবিষয়ক প্রতিবেদনে চোখ বোলায়। আজও তেমনই একটি লেখা মন দিয়ে পড়ছিল। এমন সময় ল্যান্ডফোনটা আর্তনাদ করে উঠল।

ঝুমা উঠে এসে ফোন রিসিভ করল। — কে বলছেন?

— গুড মর্নিং মিসেস।

ওপ্রান্তের লোকটির কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল ঝুমা। এ তো সেই ব্যক্তি যে মাকে নার্সিংহোমে ফোন করেছিল। পরে পরেই মায়ের হার্ট অ্যাটাক হল। কী বলতে চায়

লোকটা? ঝুমার সিক্সথ সেন্স জাগ্রত হয়ে উঠল। আড় চোখে তাকিয়ে দেখল বিছানার দিকে, বিশাল ডানদিকে কাত হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

সাধারণত এত বেলা পর্যন্ত বিশাল ঘুমোয় না। ভোর পাঁচটার মধ্যে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে ঘণ্টাখানেক শরীরচর্চা করে। তারপর হালকা টিফিন। সময় থাকলে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করে। নাহলে ধরাচুড়া গায়ে চাপিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু গতরাতটা সে বাইরে কাটিয়ে ভোরবেলা ঘরে ফিরেছে।

ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটি জিজ্ঞাসা করল, বিশালবাবু কি ঘরে আছেন?

ঝুমা আর-একবার ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকাল। তারপর বলল, না। কেন বলুন তো?

— আপনাকে কিছু গোপন কথা বলার আছে। প্লিজ একটু মন দিয়ে শুনবেন।

— হোল্ড প্লিজ। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি।

রিসিভারটা টেবিলের উপর রেখে আস্তে করে তোয়ালে চাপা দিল। তারপর দ্রুতপায়ে খাটের কাছে এসে বিশালের পিঠে হাত দিয়ে নাড়া দিল। — তাড়াতাড়ি ওঠো।

— উঁ! কী হল?

— আস্তে কথা বলো।

— কেন! কী হয়েছে?

— একটা ফোন আছে। সেই লোকটি যে মাকে...

— আর ইউ সিয়োর? একলাফে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল বিশাল।

— ওই কণ্ঠস্বর আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

— ঠিক আছে তুমি সাড়া দাও। ও কথা বলা শুরু করলে রিসিভার আমাকে দেবে।

— হ্যাঁ বলুন। বিশাল অনুমতি দিলে সাড়া দিল ঝুমা।

ওপ্রান্তের লোকটি বলতে শুরু করলে এপারে রিসিভার হাত বদল হয়ে গেল। লোকটি বিশালের নামে সত্যমিথ্যা মিশিয়ে অনেক কথা শুনিয়ে শেষে বলল, আপনার ভালোর জন্যই বললাম। সাবধানে থাকবেন।

কোনো কথা না বলে রিসিভার ক্রেডেলে রেখে দিয়ে ঝুমার দিকে তাকাল বিশাল। তার চোখেমুখে চরম উৎকণ্ঠা।

— খুব পরিচিত গলা তাই না? জিজ্ঞাসা করল ঝুমা।

— হুম্! অথচ শনাক্ত করা গেল না। ডাহা মিথ্যে বলল বিশাল। আসলে লোকটি মুখ খোলা মাত্রই সে তাকে চিনে ফেলেছে। ঝুমাকে বলল না কারণ, তাতে করে ঝুমা অত্যধিক আপসেট হয়ে পড়বে। আর বিশাল চায় না এই মুহূর্তে সে কোনোরকম মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

— কী বলল লোকটা?

— তোমাকে সাবধান করার জন্য ফোন করেছিল।

— কী রকম?

— ও বলছিল আমি নাকি তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করছি। আমার ভালোবাসা নাকি অভিনয়।

— বাস্টার্ড একটা। তুমি জবাব দিলে না কেন?

— প্রয়োজন ছিল কি? কে কী বলল তাতে আমার কিছু আসে যায় না ঝুমা। তুমি কী ভাবো সেটাই আসল কথা। এনিওয়ে আমাকে একটু বেরুতে হবে। চরণ বলছিল লিয়াকত অসুস্থ, ওকে দেখে আসি।

উঠে দাঁড়াল বিশাল। তারপর বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে বসল। কলি টিফিন রেডি করে টেবিলে ঢেকে রেখেছে। হোমমেড স্যান্ডউইচ আর ব্ল্যাক কফি। ধীরেসুস্থে টিফিন করে ওয়াডরোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের ওপারের বস্তির এক বিধবার বাড়িতে পেইংগেস্ট থাকে লিয়াকত। গলির মুখে গাড়ি রেখে হাঁটতে শুরু করল বিশাল। নোংরা গলি, আঁশটে গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঢাকা দিল। তিন-চার বছরের একটি ছেলে রাস্তার উপরেই পেট খালি করতে বসেছে। অনতিদূরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে, ছেলেটির মা হবে হয়তো। অপরিচিত পুরুষমানুষ দেখে সে লম্বা ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকল। বিশাল গা করে না, সোজা লিয়াকতের বাসায় গিয়ে কড়া নাড়াল।

— স্যার আপনি? দরজা খুলে সামনে বিশালকে দেখে চমকে উঠল লিয়াকত।

— শুনলাম তুমি অসুস্থ। তাই দেখতে চলে এলাম।

— না মানে, হ্যাঁ। পেটে সামান্য ব্যথা উঠেছিল। এখন ভালো আছি। আসুন স্যার ভিতরে আসুন।

লিয়াকত একপাশে সরে দাঁড়ালে ভিতরে প্রবেশ করল বিশাল। নিঃশব্দে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। দশ-তেরো মাপের ঘরে খাট-আলমারি, টিভি-ফ্রিজ সঙ্গে একটি ওয়াশিং মেসিন গাদাগাদি করে রাখা আছে। ঘরের বিপরীত দুইপ্রান্তে দুটি দরজা। একটি বাইরের দিকে। দ্বিতীয়টি অন্দরমহলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী।

লিয়াকত ভিতর থেকে একটি প্লাস্টিকের চেয়ার এনে দিল। বসল বিশাল। তারপর বলল, উধমপুর থেকে তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে টেনশনে ছিলাম। চরণকে জিজ্ঞাসা করলে সে তোমার অসুখের কথা বলল।

— মাঝেমাঝে ওই ব্যথাটা ওঠে স্যার। আসলে একসময় খুব ড্রিংক করেছি। সে কারণেই হয়তো...

— ভালো ডাক্তার দেখাও। রোগ পুষে রাখলে পরে ভুগতে হবে। থামল বিশাল। তারপর কিছু চিন্তা করে নিয়ে বলল, বেণীবাবুকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে গেলে কেন? তোমাকে তো খুন করতে বলা হয়নি?

— আসলে। মানে ওই আর কি স্যার। বোমা আমিও মারতে চাইনি, কিন্তু...

— চরণ বলেছিল?

— ঠিক সেভাবে...

লিয়াকত কথা সম্পূর্ণ করতে পারল না। ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে ট্রে-তে করে দু-কাপ চা নিয়ে এল। লিয়াকত তার হাত থেকে ট্রে নিয়ে বিশালের দিকে বাড়িয়ে ধরল। — নিন স্যার।

বিশাল একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, ছেলেটি কে লিয়াকত?

— বাড়িওয়ালির ছেলে।

— হু! কাপে চুমুক দিল বিশাল। সেই অবসরে লক্ষ্য করল ছেলেটির তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মনে হল সে যেন তাকে কিছু বলতে চাইছে। লিয়াকত থাকায় সাহস পাচ্ছে না।

— কী নাম তোমার? বিশাল উদ্যোগী হয়ে আলাপ জুড়ে দিল।

— সুরজ।

— পড়াশোনা করছ?

— এবার মাধ্যমিক দেব।

— গুড! মন দিয়ে পড়াশোনা করো।

বিশাল পকেট থেকে বের করে পাঁচশো টাকার একটা নোট দিতে গেলে ছেলেটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, সরি স্যার আমি নিতে পারব না। মায়ের বারণ আছে।

— মাকে খুব ভালোবাসো?

মাথা দুলিয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ করল সুরজ।

— ওর দ্বারা কিস্‌সু হবে না স্যার। ডেঁপো গুন্ডা একটা। লেখাপড়ায় মন নেই। দিনরাত শুধু খেলা আর খেলা।

লিয়াকতের কর্তাগিরিতে সুরজ বিরক্তবোধ করে। অসন্তুষ্ট চিত্তে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা শেষ করে কাপ লিয়াকতের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাল। তারপর সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, রাতের দিকে বাংলোয় এসো জরুরি কাজ আছে।

গাড়ি ঘিরে কয়েকটি বাচ্চাছেলে ঘোরাঘুরি করছিল। দূর থেকে বিশালকে আসতে দেখে তারা এদিক ওদিক কেটে পড়ল। বিশালের মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার কথা। বস্তিতে কোনো গাড়ি ঢুকলে বন্ধুবান্ধব মিলে ছুকছুক করত। গাড়িতে হাত বোলাত। কেউ কেউ ড্রাইভার হয়ে কাল্পনিক স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখে ভুমভুম আওয়াজ করত।

হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়তে বিশালের চোখজোড়া অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। অন্তরগহিন তোলপাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে গাড়িতে উঠে বসল। অতঃপর গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে দ্রুত উঠে এল মেন রাস্তায়।

ঠিক তখনই লুকিংগ্লাসে সুরজকে ছুটে আসতে দেখল। গাড়ি রাস্তার একপাশে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে কাছে এসে দাঁড়ালে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে খোকা?

— আপনিই বিশালবাবু, লিয়াকতকাকুর বস?

— কেন বলোতো? আগ্রহী হয়ে উঠল বিশাল।

— আপনার সঙ্গে কথা আছে। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল সুরজ। তারপর বলল, এখানে বলা যাবে না। ও দেখতে পেলে আমাকে মেরে ফেলবে।

ঝট করে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বিশাল বলল, উঠে এসো। যেতে যেতে কথা হবে।

আর-একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটিয়ে দিল বিশাল। — বলো সুরজ কী যেন বলবে বলছিলে?

এখনও ভয় কাটেনি সুরজের। বারবার পিছন ফিরে দেখছে লক্ষ্য করে বিশাল বলল, আমি আছি তোমার সঙ্গে। নির্ভয়ে বলো কী হয়েছে।

— কাকু খুব বাজে মানুষ। মায়ের উপর খুব অত্যাচার করে। ভাল্লাগে না আমার। স্যার ওকে আমাদের বাড়ি ছাড়তে বলে দিন। আপনার পায়ে ধরছি আমার মাকে বাঁচান।

কেঁদে ফেলল সুরজ। বিশাল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কেঁদো না সুরজ। আমি ওকে আজই বাড়ি ছাড়তে বলে দেব। থামল বিশাল। তারপর বলল, আর কিছু বলবে?

— কাকু বলতে বারণ করেছে তবুও আপনাকে বলছি। গতরাতে চরণকাকু এসেছিলেন।

— চরণকাকু প্রায়ই আসেন তাই না?

— হ্যাঁ।

— তারপর কী হল বলো?

— কিছুক্ষণ বাদে আরও দুজন এসেছিলেন। ওদের নাম বলতে পারব না। দরজা বন্ধ করে কী সব আলোচনা করছিলেন। আমি চা দিতে এসে শুনলাম চরণকাকু বলছেন অবিনাশ চৌধুরীর কথামতো কাজ করতে পারলে এক কোটি টাকা দেবেন।

— তারপর?

— একজন কী করতে হবে জানতে চাইলেন, তখন চরণকাকু বললেন...। কথা অসমাপ্ত রেখে সুরজ বিশালের দিকে তাকাল।

— থামলে কেন সুরজ, বলো চরণ কী বলল?

— আপনাকে...

— আমাকে খুন করবে তাইতো?

— হুঁ।

ততক্ষণে গাড়ি রেলগেটের কাছে চলে এসেছে। রেল-ফটক বন্ধ। পিঁপড়ের সারির মতো অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটি বড়ো লরির আড়ালে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুরজকে নামিয়ে দিয়ে বিশাল বলল, বাড়ি যাও। কাল থেকে লিয়াকত মাকে বিরক্ত করবে না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরজকে নামিয়ে দিয়ে বিশাল সোজা চলে এল পদ্মানদীর চরে, যেখানে মরিচার গোপন আস্তানায় বিদিশাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঝোপঝাড়-গাছপালায় ঢাকা সবুজদ্বীপ। গাছপালার আড়ালে কোনো বাড়ি থেকে থাকলেও দূর থেকে তা বোঝার উপায় নেই। তাছাড়াও অন্য একটি ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে, চরণ কি আদৌ বিদিশাকে এখানে নিয়ে এসেছে? যদি না আসে, তাহলে কোথায় যেতে পারে? বিচার-বিশ্লেষণ করে লিয়াকতের গ্রামের বাড়িটাকেই উপযুক্ত মনে হল তার। সঙ্গে সঙ্গে সে মনস্থির করল, এখানে বিদিশাকে না পাওয়া গেলে পরে সেখানেই ধাওয়া করবে।

নদীর তীরবর্তী একটি বাবলা গাছের আড়ালে গাড়ি দাঁড় করাল বিশাল। ড্যাশবোর্ডের ছোট্ট কুঠুরি থেকে অটোমেটিক রিভলবারখানা বের করল। ভেঙে দেখে নিল বুলেটগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর রিভলবারের ডগায় সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

চর জেগে ওঠায় এদিকে নদীর নাব্যতা তেমন নেই। জলে বড়োজোর গোড়ালি ডুবতে পারে। জুতো পরেই নেমে পড়ল বিশাল। জলকাদা ভেঙে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকল চর অভিমুখে।

ডাঙায় উঠে মহা ফাঁপড়ে পড়ল। কস্মিনকালে এখানে মানুষের পা পড়েছে বলে মনে হয় না। চারদিকে ঘন জঙ্গল। গাছপালার আড়ালে কোথাও মরিচার আস্তানা থেকে থাকলেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তাকে যে খুঁজে পেতেই হবে। গভীর জলে ডুব

দিয়ে হারানো জিনিস পেতে হলে যেমন আন্দাজের উপর ভর করে ডুব দিয়ে যেতে হয়, তেমনই সে লতাগুল্ম মাড়িয়ে, গাছপালার ভিড় ঠেলে ছোটাছুটি করতে লাগল। কখনও ডানে তো কখনও বামে। কখনও সামনে, কখনও পিছনে। এইভাবে অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করার পর মূল ভূখণ্ড থেকে মাইলখানেক দূরত্বে এসে এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। কমবেশি পঞ্চাশ মিটার দূরে কোনো একটি উৎস থেকে তীব্র আলোকরশ্মি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

দিনের বেলায় সূর্যালোককে হার মানায় কোন সে জ্যোতি? অবাক না হয়ে পারল না বিশাল। সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, এত জোরালো আলো কোত্থেকে আসছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ 'ইয়েস ইয়েস' চিৎকার করে উঠল। অতঃপর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে আলোর উৎস লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল।

ছোটোবেলায় মা-দিদাকে আগনায় চাল-গম-আটা শুকোতে দিতে দেখেছে। মহার্ঘ্য খাদ্যদ্রব্য পাখপাখালির অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে একখানা আয়না সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা হত। সূর্যালোক আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে পড়ত শুকোতে দেওয়া জিনিসের উপর। এতে করে সত্যি সত্যি পাখির অত্যাচার প্রতিহত করা যায় কিনা বিশালের জানা নেই। তবে প্রতিফলিত আলোক দিনের বেলাতেও স্পষ্ট বোঝা যায়। বাল্যস্মৃতি মন্থন করে সে নিশ্চিত হল, এও প্রতিফলিত আলোক। তবে আয়নার নয়, ঘরের চালের টিন থেকে প্রতিফলিত।

বিশালের অনুমানই সঠিক। বাড়িটার দেয়াল-চাল সবই টিনের তৈরি। নতুন টিনে রোদ পরে ঝিকমিক করছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে একঝাড় কাঁটাঝোপের আড়ালে দাঁড়াল সে। যদি কারও দেখা পাওয়া যায়? মিনিট দশেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও কারও দেখা পাওয়া গেল না। তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে অটোমেটিক রিভলবারখানা ডানহাতে চেপে ধরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। আবার একটু অপেক্ষা। ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিল। তারপর দরজার পাল্লায় আঘাত করতে উদ্যত হল। এমন সময় পিছনে দ্রুত পদবিক্ষেপের আওয়াজ। চকিতে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল সে। ততক্ষণে এক যুবক দৌড়ে এসে তার গলায় আগ্নেয়াস্ত্র চেপে ধরেছে।

— কে তুমি? কী চাই এখানে?

যুবকের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে চাপদাড়ি। কপালের মাঝখানে কাটা দাগ। মরিচা সম্পর্কে চরণের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে খাপে খাপে মিল। এতটুকু বিচলিত না হয়ে বিশাল বলল, তুমি মরিচা?

— কে তুমি, আমাকে চিনলে কেমন করে?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিশাল দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিল, চরণ কোথায়?

— তার সঙ্গে তোমার কী দরকার?

— আমি তোমাদের বস। বিশাল আমার নাম।

— তুমি যে-ই হও ভিতরে যাবার অনুমতি নেই।

মরিচা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল। বিশাল প্রস্তুত ছিল, জুজুৎসুর প্যাঁচে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে রিভলবারের ট্রিগার চেপে ধরল। সাইলেন্সার যুক্ত থাকায় বিস্ফোরণের শব্দ হল না। মরিচার মরণার্তনাদে চমকিত হয়ে ক-টা পাখি চঞ্চল হয়ে উঠে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে পালাল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল বিশাল। একলাফে মৃতদেহ ডিঙিয়ে দরজার কাছে এসে ঠেলা দিতে একটা পাল্লা সরে গিয়ে পথ করে দিল। শিকারি মার্জারের মতো নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে গেল সে।

দুটো মাত্র কামরা। প্রথমটার দরজা হাট করে খোলা। অর্থাৎ দ্বিতীয় কামরায় বিদিশা আছে। বিশালের মাথার রগ চিনিক করে নেচে উঠল।

— শয়তানটা বিদিশার কোনো ক্ষতি করেনি তো?

কপাটে লাথি মারতে গিয়ে থমকাল। চরণকে বুঝতে দিলে হবে না, তা নাহলে সে বিদিশাকে সামনে দাঁড় করিয়ে কেটে পড়ার সুযোগ নেবে। আস্তে করে কপাটে টোকা মারল।

সঙ্গে সঙ্গে চরণের গলা ভেসে এল, মরিচা পরে এসো।

ঠক-ঠক-ঠক। উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকল বিশাল। একসময় বিরক্ত হয়ে চরণ কপাট খুলে খিস্তি দিয়ে উঠল, শালা শুয়োর! ডিসটা...

কথা শেষ করার সময় পেল না সে। অটোমেটিক রিভলবার থেকে একঝাঁক বুলেট ছুটে গিয়ে তার ছাতি ঝাঁঝরা করে দিল।

— কুত্তা! মা তোকে ডাস্টবিন থেকে তুলে এনে বুকে আশ্রয় দিয়েছিল। তোকে আমি ছোটোভাইয়ের মতো স্নেহ করতাম। সেই তুই কিনা আমার সঙ্গে বেইমানি করলি? থু!

প্রবল আক্রোশে বিশাল মৃতদেহের মুখে লাথি মেরে চিৎকার করে বলতে থাকল, শালা তুই আমার মাকে খুন করেছিস। আমার নামে মিথ্যে বলে ঝুমার মন ভাঙাতে চেষ্টা করেছিস। মৃত্যুর থেকেও কঠিন শাস্তি প্রাপ্য ছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিদিশা বিস্ময়বিমূঢ়। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন, ভয়ার্ত চোখমুখ। বিশাল তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে পরনের টি-শার্ট খুলে তার হাতে দিয়ে বলল, তোমার আর কোনো ভয় নেই বিদিশা। শার্টটা পরে নাও।

বিদিশা পাথরের মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন নেই। বিশাল ঘরের এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে একটি জলের জাগ দেখতে পেল। জাগ থেকে খানিকটা জল হাতের তালুতে নিয়ে তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে দিল।

জল স্পর্শে চেতনা ফিরে হু হু করে কেঁদে ফেলল সে। বিশাল কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কেঁদো না বিদিশা। শান্ত হও।

বিদিশা কোনো কথা বলতে পারল না, মুখ তুলে চাইল শুধু। বিশাল আবারও বলল, সরি বিদিশা। চরণের কথায় বিশ্বাস করে তোমাকে এখানে পাঠানো ভুল হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি শয়তান তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে। প্লিজ শার্টটা পরে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

— কেন আপনাকে বিশ্বাস করব? কী গ্যারিন্টি আছে আপনি আমাকে আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবেন না? আহত গোখরোর মতো ফোঁস করে উঠল বিদিশা।

বিশাল তার কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করল না। একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বেরিয়ে এল।

দরজার মুখে আরও একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বিদিশা আঁতকে উঠল, ওহ্ গড!

— ওকে আমি মারতে চাইনি। কিন্তু ওকে না মারলে আমিই ওর হাতে খুন হয়ে যেতাম।

— বিদিশার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ নির্গত হল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল তার কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলল, দেরি কোরো না বিদিশা। কাম অন, ফাস্ট।

— অ্যাঁ। কী বলছেন? বিদিশা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

— এখন বেশি কথা বলার সময় নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।

বিশাল পুনরায় বিদিশার হাত ধরে টান দিল। সে আর আপত্তি করল না। বিশালের পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল।

— আবার কোন নরকে যেতে হবে আমাকে? প্রাণপণে দৌড়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বিদিশা।

— উধমপুর। নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে তুমি। পিছনের দরজা খুলে দিয়ে বলল বিশাল।

— আমাকে বাঁচাতে নিজের দুজন লোককে খুন করলেন। মুক্তিপণ না নিয়েই ছেড়ে দেবেন। তাহলে কিডন্যাপ করেছিলেন কেন? গাড়িতে উঠে বসে বলল বিদিশা।

বিশাল চালকের আসনে বসে কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল। তারপর গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়ে বলল, তোমার প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। দ্য ব্লাডি ডগ কৈলাসপ্রসাদ রায়কে জব্দ করতেই তোমাকে কিডন্যাপ করেছিলাম। টাকা খাইয়ে বেণীবাবুকে দিয়ে কারখানায় হরতাল করিয়েছি। বেণীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বিদেশের নাম জড়িয়ে রটনা আমার লোকেরই কাজ।

— বাবা এমন কী অপরাধ করেছেন যে আপনি আমাদের সোনার সংসার ভেঙে খানখান করে দিলেন?

— তাঁর অপরাধের সীমা নেই। শুনলে তুমিও তাকে ঘৃণা করবে।

বেলা পড়ে আসছে। পশ্চিম আকাশ চুঁইয়ে নামছে গোধূলি রং। লোকালয় ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ বেওয়ারিশ লাশের মতো বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে। খাদ্যান্বেষণে যাওয়া পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে যে যার বাসায় ফিরছে। রাখাল বালকেরা পল্লিগীতির সুর ভাজতে ভাজতে গোরুর পাল নিয়ে গৃহ অভিমুখে ফিরছে ধীর লয়ে।

সামনে জনবহুল এলাকা। বাস স্টপেজ। বহুলোকের আনাগোনা। ধীরে ধীরে গাড়ির গতি কমিয়ে আনল বিশাল। সাবধানে জায়গাটা পার হয়ে এসে সিগারেট জ্বালিয়ে ধূমপানে মনোনিবেশ করল।

— আমি বিশ্বাস করি না বাবা এমন কোনো কাজ করতে পারে।

— তোমার বিশ্বাস করা না-করায় কিছু আসে যায় না। তোমার চোখে সে দেবতা হলেও আমি তাঁকে শয়তানের অবতার মনে করি। কৈলাসপ্রসাদ রায় চরিত্রহীন লম্পট একটা।

— চুপ করুন। বাবার নামে একটিও বাজে কথা শুনতে চাই না আমি।

— সেটাই স্বাভাবিক! সব সন্তানের কাছেই তার বাবা হিরো। ভগবানের অবতার। সেই বাবার অপকর্ম যখন প্রকাশ হয়ে পরে সন্তানের মেনে নিতে কষ্ট হয়। প্রথমে অস্বীকার করে, তারপর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে চোখের জলে বুক ভাসায়। তোমার বাবাও তেমনি একজন প্রতারক, লম্পট।

— স্টপ ইট! স্টপ ইট! বিদিশা প্রচণ্ড আক্রোশে চিৎকার করে উঠে আরও বলল, বাবাকে অপমান করার কোনো অধিকার নেই আপনার।

— আছে! তাঁকে নিয়ে হাজার কথা বলার অধিকার আমার আছে।

— কোন অধিকারের কথা বলছেন আপনি?

— যে অধিকারে কৈলাসবাবুর নামে তুমি বদনাম শুনতে চাইছ না। সেই অধিকারেই আমি তাকে গালমন্দ করছি।

— কী বলতে চাইছেন আপনি? চোয়াল শক্ত করে বলল বিদিশা।

— কৈলাসপ্রসাদ রায় শুধু তোমার আর বিদেশের জন্মদাতা নন। আমিও তাঁর ঔরসজাত সন্তান। এক মায়ের পেটের না হলেও তোমার-আমার শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

এ-কথা শুনে বিদিশার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতলস্রোত বয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য সে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এসব আপনি কী বলছেন? বাবার দ্বিতীয় সংসার থাকলে আমরা জানতাম না?

সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কিছু বলল না। একদলা কান্না অন্তরগহিন তোলপাড় করে উঠে এসে গলা অবরুদ্ধ করে দিল। কান্না হজম করে বলল, নারে বোন উনি আমার মাকে নিয়ে সংসার পাতেননি। তাঁর কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়েছে মা। আমি তার ফসল।

উলটো দিক থেকে একটি সরকারি বাস প্রচণ্ডবেগে ধেয়ে আসছে। বিশাল সিগারেটের পোড়া অবশিষ্টাংশ বাইরে ফেলে দিয়ে নিপুণ হাতে পাশ কাটিয়ে এসে পুনরায় বলল, তাকে আমি যে কোনো সময় মেরে ফেলতে পারতাম। মায়ের বারণ ছিল বলে স্পর্শ করিনি। আসলে মা জানত না আমার স্বরূপ। আমি একজন মাফিয়া ডন। খুনখারাপি, লড়াই-ঝগড়া আমার ব্যাবসার অঙ্গ। একথা আমি তাকে কোনোদিন জানতে দিইনি। আপশোশ আমি তার সঙ্গেও ছলনা করেছি, আমি তার অপরাধী।

— দাদা! মমতা মাখা কণ্ঠে ডেকে উঠল বিদিশা।

— আঃ! বিশালের অন্তরগহিন তোলপাড় করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এমন সময় বিশালের মোবাইল বেজে উঠল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ক্রিনে চোখ রাখল সে। মুম্বাই থেকে রুমানা। কল রিসিভ করে সাড়া দিল, হোয়াট আ সারপ্রাইজ! তারপর বলো কবে তোমাকে সিনেমার পর্দায় দেখব?

তার নায়িকা হবার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন এক গুজরাটি। নরিন্দর সবজিওয়ালা তার নাম। প্রথম দর্শনেই রুমানাকে ভালো লেগে যায় তাঁর। সিনেমায় জায়গা না দিয়ে তিনি ঘরে জায়গা দিয়েছেন। একথা বলে ঝুমা কেমন আছে জানতে চাইল রুমানা। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশাল জানাল, সি ইজ প্রেগনান্ট। ভালোই আছে।

অভিনন্দন জানিয়ে রুমানা তাদের মুম্বাই ঘুরতে আসার আমন্ত্রণ জানালে বিশাল বলল, যেতে পারি যদি সেখানে একটা ফ্ল্যাট দেখে দাও।

— ফ্ল্যাট কী হবে? আমাদের বাসাতেই উঠবেন।

— আমি ওখানে সেটেল হতে চাই রুমানা। এ জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছি। ঝুমাও চায় অন্ধকার জগৎ ছেড়ে দিয়ে আমরা আলোয় ফিরি। তোমার স্বামী নামকরা লোক, অনেক জানাশোনা তাঁর। ওঁকে বলো আমার জন্য একটি ফ্ল্যাট দেখে দেবেন। না না। ভাড়া নয়, কিনে নেব।

ওয়েলকাম জানিয়ে লাইন কেটে দিল রুমানা। মোবাইল সেটটা ড্যাশবোর্ডের উপর রেখে দিয়ে বিশাল ড্রাইভিঙে মনোনিবেশ করল।

— আমাকে বউদির কাছে নিয়ে চলুন দাদা। আমি তাকে উধমপুরের বাড়িতে নিয়ে যাব। বাবাকে বাধ্য করব আপনাকে স্বীকার করে নিতে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুলল বিদিশা।

— তা আর সম্ভব নয় বিদিশা।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। পঞ্চাননতলার মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিদিশাকে উদ্দেশ্য করে বলল, এখান থেকে গাড়ি ধরে উধমপুর পৌঁছোতে তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়। যাও বোন ঘরে ফিরে যাও।

— কিন্তু দাদা...

— এখন আর কোনো কথা নয়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। পলাশ সেখানে তোমার অপেক্ষা করছে।

বিশাল গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে ধরলে বিদিশা নেমে এল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে ডাকল, দাদা।

— এই ক-দিনে তোর উপর অনেক অত্যাচার করেছি। পারলে এই নরাধমকে ক্ষমা করে দিস বোন। গাড়িতে উঠে বসল বিশাল। তারপর আরও বলল, কৈলাসবাবুকে বলিস তাঁর ওপর আমার আর কোনো দাবি নেই।

উত্তরের প্রত্যাশা না করে গাড়ি ছুটিয়ে দিল বিশাল। বিদিশা একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকল, যতক্ষণ না গাড়ি দৃষ্টির আড়াল হল।

ভাকুরি মোড় ছাড়িয়ে এসে ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল বিশাল। একটু অসুবিধার মধ্য দিয়ে যেতে হলেও এই পথ ধরে লিয়াকতের ভাড়াবাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়। এই একটা বিশ্বাসঘাতক এখনও বেঁচে আছে। যে করেই হোক শয়তানটাকে আজ নিকেশ করতেই হবে।

গন্তব্যে পৌঁছে নিরাশ হতে হল। সুরজ জানাল দুপুরের দিকে পুলিশ এসে লিয়াকতকে তুলে নিয়ে গেছে। নিস্ফল আক্রোশে বিশালের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। পরে-পরেই তার মাথায় একটি ভাবনা চেপে বসল, হঠাৎ পুলিশ কেন লিয়াকতকে তুলে নিয়ে গেল? গোলদারবাবু কেন ইনফর্ম করলেন না? তবে কি ওঁকে না জানিয়েই এসপি রেড করেছেন? নাকি গোলদারবাবুও...!

বিশাল এক দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল। তারপর ইঞ্জিন চালু করেই বাড়িতে ফোন দিল। বার কয়েক রিং হওয়ার পর কলি রিসিভ করল।

— তোর বউদি কোথায় রে?

— টিভিতে খবর দেখছে।

— বাড়িতে পুলিশ এসেছিল?

— না দাদাবাবু।

— থ্যাংক গড। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল বিশাল। এই অবসরে কলি জানতে চাইল বউদিকে ফোন দেবে কিনা। মানা করে দিয়ে লাইন কেটে দিল বিশাল।

নিশ্চয় বিদিশাকে অপহরণের কেসে লিয়াকতকে তোলা হয়েছে। চরণ না বললে অবশ্য তার জানার কথা নয় বিদিশাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেও যখন

চরণের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন বিষয়টি তার অজানা থাকার কথা নয়। পুলিশের জেরায় সে যদি সব কথা জানিয়ে দেয় তাহলে চরণদের খুন হবার সংবাদ এতক্ষণে পুলিশ জেনে ফেলেছে। বাট। তাহলে এতক্ষণ বাড়িতে পুলিশের চড়াও হবার কথা। নাহ্, মাঝখানে কোনো ষড়যন্ত্র চলছে। ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল বিশাল। এই মুহূর্তে পুলিশমহলে কী সব কর্মকাণ্ড চলছে জানতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? গোলদারবাবুকে ফোন করলে হয়তো কিছুটা আভাস পেতে পারত। প্রশ্ন হল তাকে ফোন করা কি ঠিক হবে?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে ড্রাইভিং করছিল বিশাল। মোবাইলের রিংটোন কানে পৌঁছোতে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। ড্যাশবোর্ডের উপর থেকে সেটটা তুলে নিয়ে হ্যালো করলে ঝুমার উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কোথায় আছ তুমি?

— কেন? কী হয়েছে?

— তোমাকে নিয়ে শহরে তোলপাড় চলছে।

— কী রকম?

বিদিশা ও তার বয়ফ্রেন্ডকে কিডন্যাপ করা থেকে শুরু করে চরণ ও মরিচার খুনের কথা উল্লেখ করে পুলিশের বয়ান সবগুলো টিভি চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে সম্প্রচার করা হচ্ছে জানিয়ে ঝুমা বলল, পুলিশ বর্তমানে মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে তোমার অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করছে।

একমুহূর্ত দেরি না করে মোবাইলের পাওয়ার অফ করে দিল বিশাল। তারপর সেটটা সজোরে রাস্তার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। আপদ তো দূর হল। কিন্তু ঝুমার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে? একরাশ দুশ্চিন্তা ধেয়ে এসে চেপে ধরল বিশালকে।

পরক্ষণে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল বিশাল। ঝুমার সঙ্গে যোগাযোগের কথা পরে ভাবলেও চলবে। তার আগে এই জায়গা ছেড়ে যাওয়া চাই। চট করে গাড়ি থেকে নেমে এল। তারপর বাইরে থেকে দরজা লক করে দিয়ে ততোধিক অন্ধকার একটি গলিপথ ধরে টুকটুক করে হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়। সুরজকে কাজে লাগাতে হবে। ওকে দিয়ে ঝুমার কাছে খবর পাঠাতে হবে। বাচ্চাছেলে, পুলিশ ওকে চট করে সন্দেহ করবে না। ভাবনাটা মাথায় আসতে দ্রুত পা চালিয়ে সুরজদের বাড়িতে পৌঁছোল।

সুরজের মা ছেলেকে বিপদ মাথায় নিয়ে পাঠাতে রাজি হলেন না। শেষপর্যন্ত পাঁচশো টাকার খানচারেক নোট হাতে ধরিয়ে দিলে তবে রাজি হলেন। তবে সুরজ নয়, কী বলতে হবে জেনে নিয়ে মহিলা নিজেই বিশালের ফ্ল্যাটে গেলেন।

মহিলা বেরিয়ে যাবার পর সুরজের কাছ থেকে একখানা চাদর চেয়ে নিল বিশাল।

সেটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রাস্তায় নামল। গলির মুখে একটি দোতলা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা টোটো আসতে দেখল। প্যাসেঞ্জার নেই, চালকের আসনে একটি কমবয়সি ছেলে। কাছাকাছি আসতে রাস্তায় উঠে এসে হাত দেখাল। টোটো থামিয়ে ছেলেটি জানতে চাইলে, কোথায় যাবেন?

বিশাল অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলল। বুঝতে না পেরে ছেলেটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল। ততক্ষণে সে ছেলেটির ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে। চকিতে তার মাথার পিছনদিকে আঘাত করল। এক আঘাতেই বাজিমাত। কাটা কলাগাছের মতো ছেলেটি উলটে পড়ে গেল রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে চালকের আসনে উঠে বসল বিশাল।

রেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে দেখল তার গাড়িটি রাস্তার পাশে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সেটা এখন আর বেওয়ারিশ নয়, একদঙ্গল পুলিশ গাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। এসপি সাধন দত্ত একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। আড় চোখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল।

— এই রোকো, রোকো। রেল লাইন ক্রস করার সময় এক কনস্টেবলকে ছুটে আসতে দেখে পিলে চমকে উঠল। হার্টবিট বেড়ে দ্বিগুণ হল। তীরে এসে তরি ডুবল বুঝি! রেল লাইনের উপর টোটো দাঁড় করিয়ে চরমক্ষণের অপেক্ষা করতে থাকল সে। কনস্টেবল কাছে এসে জানতে চাইলেন, কোথায় যাবি?

— হাসপাতালে যাচ্ছি স্যার।

— এখন ততটা ঠাণ্ডা নেই। চাদর মুড়িয়েছিস কেন?

— আজ্ঞে স্যার গায়ে খুব জ্বর। ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। হ্যাচ্চো!

— এই তোর করোনা হয়নি তো!

বিশাল সুযোগটা কাজে লাগাল। উপর্যুপরি গোটা তিন হ্যাচ্চো ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কী জানি স্যার হলে হতেও পারে।

একথা শুনে কনস্টেবল আঁতকে উঠে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখে-শুনে বিশালের হাসি পেল, কোনোরকমে তা সামলে টোটো চালনায় মনোনিবেশ করল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরজের মাকে দিয়ে বিশাল খবর পাঠিয়েছিল কলিকে নিয়ে ঝুমা যেন গঙ্গাব্রিজের নীচে অপেক্ষা করে। কিন্তু ঝুমা কলিকে সঙ্গে নিল না। অযথা সে কেন ঝঞ্ঝাটে জড়াবে? বরং দেশের বাড়িতে ফিরে যাক, সেটাই হবে তার পক্ষে উত্তম। ইত্যাদি পাঁচ-সাত কথা

ভেবে কিছু টাকা দিয়ে কলিকে সুরজের মায়ের সঙ্গে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। তারপর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র, গচ্ছিত নগদ ও সোনাদানা ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে একাই এসে দাঁড়াল ব্রিজের তলায়।

এদিকে বিশাল রেললাইন ক্রস করে সোজা চলে এল চুয়াপুরে। রাস্তার ধারে টোটো রেখে প্রবেশ করল লছমনপ্রসাদজির গ্যারেজে। একখানা বোলেরো গাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘুর পথে এসে পৌঁছোল ব্রিজের তলায়। ঝুমা অপেক্ষা করছিল, তাকে তুলে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল ফারাক্কা অভিমুখে।

— তুমি চরণকে মেরে ফেললে? গাড়িতে উঠে ঝাঁঝালো কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিল ঝুমা।

— বেশ কিছু দিন থেকে ওর গতিবিধি গোলমেলে ঠেকছিল। বুঝতে পারছিলাম সে আমার সঙ্গে গেম খেলছে। প্রমাণ না থাকায় এতদিন কিছু বলতে পারিনি। তারপর যেদিন তুমি সেই ফোনটা দিলে কথা শুনে নিশ্চিত হলাম আমার সন্দেহ সঠিক। ও-ই মাকে নার্সিংহোমে ফোন করেছিল। মেয়ে দেখতে যাবার নাম করে রানাঘাটে অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে মিট করেছিল। কোটি টাকার বিনিময়ে আমাকে খুন করার সুপারি নিয়েছিল সে।

থামল বিশাল। একটু বাদে আবারও বলতে থাকল, এই এতটুকু বয়সে মা ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমি তাকে ছোটো ভাইয়ের মতো ভালোবাসতাম। এই হাত দিয়ে ওকে খাইয়েছি, গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছি। কোলে বসিয়ে নিয়ে কত আদর করেছি। আর আজ এই হাত দিয়েই ওকে খুন করলাম। হা ঈশ্বর! আর পারছি না। মুক্তি দাও।

স্টিয়ারিঙে সজোরে কিল মেরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিশাল। ঝুমা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ভেঙে পরলে হবে না বিশাল। শক্ত হও। পথ এখনও অনেক বাকি।

ঝুমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল কিছু বলল না। একমনে ড্রাইভ করতে থাকল। গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ করে ভাগ্য বিড়ম্বিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা মনে পড়ে গেল তার। নবাবের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের আশ্চর্য মিল খুঁজে পেল সে। এমনই এক নিশীথ রাতে তিনিও রাজপাট ফেলে সপরিবারে চোরের মতো পালিয়েছিলেন। তাঁর তবু ভরসাস্থল ছিল। পাটনা পৌঁছোতে পারলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হত অন্যভাবে। সম্ভব হয়নি ক্ষমতালোভী কিছু আত্মীয় ও বিশ্বাসভাজনের বিশ্বাসঘাতকতায়। জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মিরজাফরেরা শেষ হয়ে যায়নি। চরণ-লিয়াকতের বেশে তারা এখনও আছে, চিরকাল থাকবে।

— বিশাল আমরা কোথায় যাচ্ছি? অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুলল ঝুমা।

— সেদিন তুমি বলছিলে এমন একটা জায়গায় যেতে সেখানে কেউ আমাদের চেনে না। আমাদের সন্তানের দিকে ইশারা করে কেউ বলবে না ও একটা মাফিয়ার সন্তান।

— ঠিক তাই। দূরে কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা।

— সে সুযোগ কি আর আমাদের জীবনে আসবে ঝুমা? মিডিয়ার দৌলতে এতক্ষণে ঘরে ঘরে আমাদের ছবি পৌঁছে গেছে। সবাই জেনে গেছে মাফিয়া ডন বিশাল প্রাণভয়ে বউকে নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। এমনও হতে পারে আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশ পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করেছে। যতই চেষ্টা করি না কেন বাঁচার পথ নেই। ফাঁসির দড়িতে হোক কিংবা পুলিশের গুলিতে মৃত্যু আমার অনিবার্য।

— না বিশাল না। এত সহজে হার মানলে চলবে না। বাঁচতে হবে তোমাকে। আমার জন্য নয়, তোমার নিজের জন্যও নয়। শুধু এর জন্য তোমাকে বাঁচতে হবে। ঝুমা তার স্ফীত পেটে হাত দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

স্ত্রীর দিকে তাকাল বিশাল। তারপর ডানহাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে বামহাত দিয়ে ঝুমার মাথাটা বুকে টেনে নিল

— রুমানা ফোন করেছিল। আমি তাকে একটা ফ্ল্যাট দেখতে বলেছি।

— তাহলে ওখানেই চলো।

কোনো কথা বলল না বিশাল। ডানদিকে চেপে এসে রাস্তা ফাঁকা পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এক্সিলিটারে চাপ দিল। ঝাঁকুনি দিয়ে গতি বাড়িয়ে হাওয়ার বেগে ছুটতে থাকল বোলেরো।

সামনেই উমরপুর মোড়। সেখান থেকে ডানদিকে রঘুনাথগঞ্জ যাবার রাস্তা, বাঁদিকের রাস্তাটি বীরভূমের প্রান্তিক শহর মুরারই হয়ে ঝাড়খণ্ডের মহেশপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশাল মনে মনে স্থির করল মোড়ে পৌঁছে বাঁদিকে টার্ন নেবে। কিছুদিন ঝাড়খণ্ডের পাহাড় জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরে তখন মুম্বাই যাবার গাড়ি ধরবে। ঝুমাকে জানালে সেও সহমত পোষণ করল।

উমরপুর মোড়ের লাইট পোস্টটি দেখা যাচ্ছে। মিনিট সাতেকের মধ্যে মোড়ে পৌঁছাবে তারা। বিশাল ঝুমাকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি উমরপুর থেকে বাস ধরে বরাহনগর চলে যাও। আমি মুম্বাই পৌঁছে তোমাকে ডেকে নেব।

— না। তোমাকে একা রেখে আমি কোথাও যাব না।

— জেদ কোরো না ঝুমা। গাছতলায় শুয়ে, ঘাসপাতা খেয়ে দিন কাটাতে পারব আমি। তুমি এখন একা নও, তোমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের সন্তানের ভালোমন্দ। এত ধকল তুমি সহ্য করতে পারবে না। ক্ষতি হয়ে যাবে।

— যা হবে হোক। কিছুতেই আমি তোমাকে একা ছাড়ব না। ওই সিট।

হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিশাল। ঝুমাকে আর্তনাদ করতে শুনে সামনে তাকিয়ে দেখে চমকে উঠল। রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি পুলিশভ্যান।

— কী হবে এখন? পুনরায় আর্তনাদ করে উঠল ঝুমা।

বিশাল ঝট করে এক্সিলিটর থেকে পা তুলে নিল। ধীরে ধীরে গাড়ি পুলিশভ্যানের থেকে পঞ্চাশ মিটার মতো দূরে স্থির হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল বিশাল। ততক্ষণে অগণিত পুলিশ তাদের ঘিরে ধরেছে। ডান-বাম, সামনে-পিছনে পুলিশ আর পুলিশ। প্রত্যেকের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

বিচলিত হল না বিশাল। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে ঝুমাকে উদ্দেশ করে বলল, মোবাইল আছে তোমার কাছে?

— হ্যাঁ। কাউকে কল করবে? উদ্‌বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল ঝুমা।

— গাড়ি নিয়ে এদিকে আসছি তুমি আর সুরজের মা ছাড়া কেউ জানে না। পুলিশে খবর দেবার সাহস ওই মহিলার নেই। তোমার...

— তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? একরাশ বিস্ময় নিয়ে স্বামীর মুখপানে তাকাল ঝুমা।

— হ্যাঁ। তোমার মোবাইলের লোকেশান ফলো করেই ওরা আমাদের গতিবিধি জানতে পেরেছে।

— ওহ গড। গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে করতে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝুমা।

— খেলার রাশ এখন ওদের হাতে। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল বিশাল। তারপর কোটের পকেট থেকে অটোমেটিক রিভলবারখানা বার করলে ঝুমা কেড়ে নিয়ে বলল, সংখ্যায় ওরা অনেক, লড়াই করে পারবে না।

— কী করতে বলছ তুমি?

বিশালের জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার সময় পেল না ঝুমা। তার আগেই হ্যান্ড মাইকে এসপি সাধন দত্তের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

— বিশাল, চারদিক থেকে পুলিশ তোমাকে ঘিরে ধরেছে, পালাবার কোনো পথ নেই। সারেন্ডার করো।

— বিশাল! আর্তনাদ করে উঠল ঝুমা।

বিশাল কিছু বলল না। আস্তে করে নিজেকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে জানালার দিকে সরে বসল। তারপর জানালার কাচ নামিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, মিস্টার এসপি সারেন্ডার করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে।

— বলো কী চাও?

— আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। কথা দিন তাকে অ্যারেস্ট করবেন না।

এসপি চট করে কোনো উত্তর দিলেন না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা অন্য অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় মশগুল হলেন। অতঃপর বললেন, ঠিক আছে তোমার কথা মেনে নেওয়া হল। তোমার কাছে যে সব অস্ত্র আছে ফেলে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এসো।

— কথা দিচ্ছেন তাকে কোনো প্রকার হ্যারাস করা হবে না।

— বললাম তো তাঁকে আমরা অ্যারেস্ট করব না। তুমি অস্ত্র ফেলে দু-হাত উপরে তুলে নেমে এসো। তারপর উনি গাড়ি নিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন। পুলিশ বাধা দেবে না।

— না, তুমি কোথাও যাবে না। ঝুমা বিশালের একটা হাত চেপে ধরল।

— না গিয়ে উপায় নেই ঝুমা। আমি না গেলে ওরা দুজনকেই মেরে ফেলবে।

— সেই ভালো। দুজনেই একসঙ্গে মরব। অন্তত এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে যাব তোমার বুকে মাথা রেখে মরতে পেরেছি। ঝুমা পুনরায় স্বামীর বুকে মাথা রাখল।

বিশাল তাকে কোলের উপর শুইয়ে নিল। তারপর তার স্ফীত পেটে পরমযত্নে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, তোমাকে বাঁচতে হবে ঝুমা। এর জন্যই তোমাকে বাঁচতে হবে। কথা দাও আমাদের সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবে। ওকে তার বাবার অন্ধকার জীবনের কথা কোনোদিন জানতে দেবে না।

ঝুমা কোনো কথা বলতে পারল না। তার দু-চোখ ছাপিয়ে গলগল করে অশ্রুধারা বয়ে যেতে থাকল।

সোজা হয়ে বসল বিশাল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর অস্ত্রটা জানালার ফাঁক গলে ছুড়ে দিল। সেটা গিয়ে আছড়ে পড়ল এসপির পায়ের কাছে। অতঃপর গাড়ির দরজা খুললে জওয়ানদের হাতের অস্ত্র নড়ে উঠল। এসপি চিৎকার করে তাদের গুলি চালাতে নিষেধ করলেন।

প্রথমে পা দুখানা পিচরাস্তায় রাখল বিশাল, পরক্ষণে পুরো শরীর বার করে এনে সোজা হয়ে বলল, অফিসার জওয়ানদের বলুন রাস্তা ছেড়ে দেবে।

এসপি সেরকমই নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানেরা রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। তখন সে ঝুমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমার আমানত তোমার কাছে রইল। তাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব তোমার। ওকে নিয়ে নিরাপদ কোনো স্থানে চলে যাও।

ঝুমা করুণ দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল। অতঃপর ড্রাইভারের আসনে বসে গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে দ্রুত অকুস্থল ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল বিশাল। এসপি সাধন দত্ত অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যান্য অফিসার, জওয়ানরাও যুদ্ধংদেহী পজিশনে অবস্থান করছেন। বিশাল এতটুকু বিচলিত না হয়ে উপরদিকে হাত তুলে ধীরে ধীরে এসপি-র দিকে এগোতে লাগল।

এসপি সাধন দত্তের মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, অপরাধী যত শক্তিশালী হোক না কেন তাকে একদিন আইনের দরবারে মাথা নত করতেই হয়। সেদিন আদালত কক্ষের বাইরে আমাকে আর আমার ডিপার্টমেন্টকে হেয় করে খুব বড়ো বড়ো কথা বলেছিলে। কী বলেছিলাম আমি তখন? একদিন না একদিন সময় আমারও আসবে। তোমার সাম্রাজ্য ভেঙে খানখান করে দেব। বেওয়ারিশ কুকুরের মতো টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লকআপে ঢোকাব। সেদিন তোমার পাশে কেউ থাকবে না।

এসপির কথার পিঠে কোনো কথা বলল না বিশাল। অফিসার বলতে থাকলেন, আজ আমার দিন। আমি বিজয়ী, তুমি পরাজিত। ফাঁসির দড়ি থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই।

বিশাল ততক্ষণে এসপির নাকের ডগায় চলে এসেছে। উভয়ের মাঝখানে পড়ে আছে অটোমেটিক রিভলবারখানা। আস্তে করে দৃষ্টি অবনত করে যন্ত্রটার অবস্থান দেখে নিল সে। তারপর ভয়ংকর ঠান্ডা গলায় বলল, অফিসার নিজের ডেরায় শৃগালও নিজেকে বাদশা ভাবে। কিন্তু সিংহ সিংহ-ই। গভীর জঙ্গল হোক কিংবা লোহার খাঁচা সবখানেই সে অদ্বিতীয়।

— তোমার মতো কত সিংহকে ল্যাজে মোচড় দিয়ে নাচিয়েছি আমি।

— তারা সিংহের পোশাকে শৃগাল ছিল অফিসার। বিশাল জাত-সিংহ। সিংহ যতদিন বাঁচে মাথা উঁচু করেই বাঁচে। তার মৃত্যুও হয় রাজকীয়।

— মাই ফুট! আমি তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব বাস্টার্ড।

এসপি গর্জন করে উঠে ধেয়ে আসতে চাইলেন। এই অবসরে বিশাল বিশেষ কায়দায় পড়ে থাকা রিভলবারের একপ্রান্তে পায়ের ঠোকা মারল। অমনি যন্ত্রটা লাফিয়ে চলে এল তার হাতে। মুহূর্তের ব্যবধানে এসপির কানের নীচে অস্ত্র চেপে ধরে চিৎকার করল, সবাই নিজের নিজের অস্ত্র ফেলে দাও, তা নাহলে অফিসারের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

সশস্ত্র জওয়ানেরা নড়েচড়ে উঠলেও গুলি চালাতে পারল না। এসপি চিৎকার করে বলতে থাকলেন, বয়েজ আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। শুট হিম। ফায়ার। ফায়ার। ফায়ার।

এই অবসরে বিশাল বামহাত দিয়ে এসপির গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। কেড়ে নিয়েছে তাঁর হাতের অস্ত্র। গেমের রাশ পুরোপুরি এখন তার হাতে। এসপিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল সামনে অপেক্ষমান পুলিশ ভ্যানের দিকে। বেগতিক বুঝে জওয়ানেরা সরে গিয়ে পথ করে দিল।

চালক ভ্যানের উপর বসেছিল। বিশাল সামনে বসায় অনুগত ছাত্রের মতো আদেশ পালন করল সে। বিশাল এসপিকে নিয়ে ভ্যানে উঠে বসে চিৎকার করে বলল, অফিসার্স একদম পিছু ধাওয়া করার ভুল করবেন না। তা হলে কিন্তু বসের লাশটাও আস্ত পাবেন না। মাইন্ড ইট। বিশাল কথা রাখতে জানে।

মোড় পেরিয়ে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে কেউ ফলো করছে না নিশ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে ভ্যানের গতি কমিয়ে আনল। অতঃপর ধাক্কা মেরে এসপিকে ভ্যান থেকে ফেলে দিয়ে পূর্ণগতিতে ছুটে চলল ফারাক্কা অভিমুখে।

ততক্ষণে পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। রাস্তা পার্শ্বস্থ গাছগাছালির আড়াল থেকে ভেসে আসছে পাখির কলতান।

"জানি না এই হাতে কতগুলো মানুষের গলা কেটেছি। আপনাকে খুন করলে সংখ্যা না হয় একটু বাড়বে।"

বিশাল বস্তির এক নিরীহ যুবক। শিক্ষিত। চাকরির খোঁজে ঘুরে হন্যে হয়ে একসময় অল্পপুঁজির একটা ব্যাবসা শুরু করে। ঘটনাক্রমে ব্যাবসাক্ষেত্রে তার সঙ্গে একটি ছেলের ঝামেলা হয়। এই ঘটনাই বিশালের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। সামান্য সিনেমার টিকিট ব্লাকার থেকে সে হয়ে ওঠে বহরমপুর শহরের বেতাজ বাদশা। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলে। বাগ মানে না শুধু একটি মেয়ে। অথচ মেয়েটিকে বিশাল অত্যন্ত ভালোবাসে। বিয়ে করতে চায়। প্রাক্তন বস হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পেতে মরিয়া। বিশালকে খুন করতে একদল পেশাদার খুনিকে শহরে পাঠিয়েছেন। এসেছেন নতুন এসপি। যে কোনো মূল্যে তিনি বিশালের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলতে বদ্ধপরিকর। এমন একটা সময় সে জানতে পারে তার জন্ম অবৈধ। বিশাল কি পিতৃপরিচয় ফিরে পাবে? নিজেকে পেশাদার খুনিদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? পাবে কি ভালোবাসার নারীটিকে নিজের করে পেতে? কিংবা এসপির তৎপরতা থেকে রক্ষা করতে পারবে নিজের ব্যাবসা?



ANDHAKARER AHANKAR
A BENGALI THRILLER NOVEL
BY MUHAMMAD SELIM REZA
RS. 300 $ 15
AVAILABLE ON WWW.DOKANDAR.IN

ISBN 9789394551237

